যাযাবরী

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

'নবযুগ নাট্য সংসদ" যাত্রাদলে

সগৌরবে অভিনীত।

—দে সাহিত্য কুটীর—

৯৮।২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

শ্রীপঞ্চানন দে কর্তৃক প্রকাশিত।

*

[illegible] টাকা

বাহির হইয়াছে। অপূর্ব নাট্যসম্পদ !!

সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত, দোলায়িত

সমাজের প্রতিচ্ছবি

নাট্য-ভারতী যাত্রাদলে অভিনীত

এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

নট-নাট্যকার শ্রীকমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাঁচার লড়াই

সামান্য বোঝাপড়ার ভুলে হয় সংসারে উন্নতি বা অবনতি। তাই শ্রমিক জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে লেখা এই 'বাঁচার লড়াই'। মূল্য ৪·০০

* * *

অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর যশের মুকুট

নট-নাট্যকার শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর সৃষ্টি

রহস্যঘন কাল্পনিক নাটক

গফুর ডাকাত

মানুষ মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় দ্বিধাহীন চিত্তে। করে মানুষের সম্পদ লুঠ— কিন্তু কেন ? কেন হয় সে ডাকাত—খুনী— লুটেরা ! আবার সুতানলির নিবিড় অরণ্যে কেনই বা গড়ে ওঠে মসজিদের পাশে মন্দির ? রঞ্জন সেন পিতাকে নিক্ষেপ করলে কারাগারে। পিতার পরিবর্তে মাতুল বিক্রমজিৎ হয়ে উঠলো রঞ্জনের কপট হিতাকাঙ্ক্ষী। চললো ষড়যন্ত্রের জাল। পিতার বুক থেকে চাবুক মেরে ছিনিয়ে নিয়ে এল দেবযানীকে, ছিন্নভিন্ন করে দিলে মলয় ও দেবযানীর আশার স্বপ্ন। পালিয়ে গেল দু'-জনে, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে হারিয়ে গেল তারা সুতানলির জঙ্গলে। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত দেবযানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গফুরের সহচর ডাকাত জয়নাল। পেয়েছিল কি মলয় তার দেবযানীকে ? ডাকাতের সঙ্গে লাগল রুদ্রপুরের তুমুল সংঘর্ষ। কিন্তু জিতলো কে ? ষড়যন্ত্রকারী মাতুল, না "গফুর ডাকাত ?" মূল্য ৪·০০ টাকা।

—বিক্রয় কেন্দ্র—

ভৈরব পুস্তকালয়

১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

(শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের গলির ভিতর)

কলিকাতা-১২

—প্রসিদ্ধ নাটক—

অগ্নিযুগের কাহিনী

রক্তে রাঙা মসনদ

সাতপাকে বাঁধা

বিজয় তোরণ

অতীতের কান্না

রক্তাক্ত গৌড়

রাতের কান্না

ফেরিওয়ালা

চন্দ্রলেখা

সমাজ

শহীদ

মুদ্রাকর :

শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ

লিপি প্রেস

৮/১বি, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

আমার পরমারাধ্যা জননীর শ্রীপাদপদ্মে ঃ—

মা !

তোমারই করুণা কণায় আমার প্রকাশ। সে ঋণ শোধ করার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু পূজা করার অধিকার আছে। তাই মাতৃপূজায় তোমার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম নিজেকে। আর বন্দনা-গানে নিয়োজিতা হলো আমার মানসী প্রতিমা যাযাবরী।

প্রণত—

ভৈরব

আমার কথা

ঘাম ঝরছে···

মাটি কাটছে শ্রমিক···

হেঁইও···হেঁইও···উদ্ধত গাঁইতি পড়ছে কঠিন মাটির বুকে—

হঠাৎ কিসে যেন চোট লাগলো, দেখা গেল গাঁইতির চোট খেয়ে মাটির নীচে দেখা দিয়েছে একটা মাটির কলস।

গ্রামের মানুষ ছুটে এলো। দেখলো সেই মাটির কলসে অতীত যুগের মুদ্রা।

আবার গাঁইতি চললো—

এবার দেখা গেল, পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ। দুর্বোধ্য পদার্থে পূর্ণ একাধিক কূপ। শেষে একাধিক নর-কঙ্কাল···

ঘটনাটি ঘটেছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মণ্ডলগ্রামে। শুরু হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা—গ্রামবৃদ্ধদের মুখ থেকে শোনা গেল অতীতের টুকরো টুকরো কথা—

আমি শুনলাম সে কথাগুলি। মনে মনে গাঁথতে শুরু করলাম সেই কথার মালা। লোকপ্রবাদ ও কিংবদন্তীর কাহিনী রূপ পরিগ্রহ করলো আমার লেখনীতে। অতীত এলো বর্তমানের দরজায়।

আমি লিখলাম অতীত বাংলার নবাব নসরৎ শাহের আমলের ছোট্ট একটি কাহিনী। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নাট্য সংস্থা নবযুগ নাট্য সংসদ আমার যাযাবরীকে অভিনয় করলেন "সোনাই দীঘির পরে" নাম দিয়ে। আমার প্রিয় প্রকাশক পঞ্চাননবাবু বললেন, ভৈরববাবু, আপনার যাযাবরী আমাকে দিন, আমি ওকে নেবো। আমিও তাঁর হাতে তুলে দিলাম। মোহিতদা (মোহিত বিশ্বাস) বললেন, আমি যাযাবরীকে সাজাবো। সাজালেন মোহিতদা তাঁর মনের মত করে। তাই তো আজ আপনাদের ঘরে আমার বনহরিণী যাযাবরী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মণ্ডলগ্রামের বুকে 'রাণা' ও একাদীঘি আজও আছে। আষাঢ় পঞ্চমীতে আজও সাড়ম্বরে পূজিতা হন দেবী জগৎগৌরী।

ইতিহাসের এই বিক্ষিপ্ত কাহিনী লেখনীর মুখে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন, আমার ধূলিতীর্থ মুলগ্রামের দুরন্ত সংঘের বন্ধুরা।

ইতি—

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

নসরৎ শাহ	বাংলার নবাব
ছোটি খাঁ	ঐ সিপাহশালার
নরপাল	মণ্ডলগাঁয়ের রাজা
সমান্তপাল	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
জয়ন্তপাল	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
নদেরচাঁদ	কবিরাজ
ঈশান	জেলে
রাণা	ঈশানের নাতি
হাসান খাঁ	তালুকদার
হোসেন খাঁ	ঐ ভ্রাতা
মামুদ খাঁ	ঐ পুত্র
শুকুর খাঁ	ঐ শ্যালক
গহরজান	ঐ শ্বশুর
কঙ্কাল	ইতিহাস

—স্ত্রী—

শিকারিণী	সামন্তপালের স্ত্রী
মঞ্জুরী	জয়ন্তের স্ত্রী
শোভানা বেগম	হাসানের স্ত্রী
একাবতী	বেদেনী

☞ অন্য কোন নামে এই নাটক অভিনয় করা নিষিদ্ধ।

যাযাবরী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

মাথায় সাপের ঝাঁপি লইয়া বেদেনী একাবতীর প্রবেশ। তাহার কণ্ঠে গীত ও ডম্বরু বাজনা শোনা গেল।

একাবতী।—

গীত।

নমস্তে মা জগৎ গৌরী
নমস্তে বিষহরি।
সবার সুখে রাখিস মাগো
শিব দেবতার ঝিয়ারী।

মায়ি জগৎ-গৌরী, তোকে নমস্কার করে চললেম—আজ যেন ভাল পয়সা রোজগার হয়। [জগৎ-গৌরীর উদ্দেশে প্রণাম করিল] দেখে যা—নাগের খেল দেখে যা। [সুর করিয়া] "চিতি আছে বোড়া আছে—আছে পদ্মমণি, গোখরো কেউটে ডোমনা আছে—আছে কালনাগিনী।"

কুদর্শন শুকুর খাঁর প্রবেশ ।

শুকুর । বহুৎ আচ্ছা—নাগিনী !

একাবতী । কে তুই ?

শুকুর । আমি নাগিনীকী খেল দেখনেওয়ালা রাহী ।

একাবতী । রাহী ! তোর মতলব কি ?

শুকুর । খেল্ দেখবো ।

একাবতী । নাগের খেল দেখবি রাহী ?

শুকুর । শুধু নাগের খেল নয়—নাগিনীর খেলও দেখতে চাই ।

একাবতী । তবে চল ওই সামনের গাঁয়ে—হোথায় আমি নাগ-নাগিনীর খেল দেখাবে ।

শুকুর । কেন ? এখানে খেল দেখানো যাবে না ?

একাবতী । আলবৎ যাবে । বাপুজীর সাথে বচপনসে এ মুল্লুকে বাস করছি, দাওয়াই দিবে—খেল দেখাবে, লেকিন তার বদলি আমি পয়সা লিবে ।

শুকুর । পয়সা !

একাবতী । হ্যাঁ রে রাহী ! তোর কাছে পয়সা আছে ?

শুকুর । না ।

একাবতী । পয়সা নাই ? তবে কি আমি মাগনা খেল দেখাবে । ছোড় ছোড়—সরক ছোড়ে দে ।

শুকুর । বেদেনী !

একাবতী । এই রাহী ! তুই ভিনদেশী—আমার নাম জানিস না,—শুনে রাখ আমার নাম একা—

শুকুর । একা !

একাবতী। হ্যাঁ রে, এখানকার সবাই আমাকে একা বলে ডাকে। আচ্ছা চলি—যবে তুই পয়সা লিয়ে আসবে, তবে আমি খেল দেখাবে, বুঝলি—[প্রস্থানোদ্যতা]

শুকুর। এই শোন!

একাবতী। [ফিরিয়া] বল।

শুকুর। টাকা দিলে খেল দেখাবি না?

একাবতী। টাকা!

শুকুর। হ্যাঁ টাকা। আমার কাছে পয়সা নাই—টাকা আছে।

একাবতী। টাকা আছে! তোর টাকা তোর কাছে থাক, আমি লিবে না।

শুকুর। টাকা নিবি না!

একাবতী। না রে রাহী, আমি নাগের খেল দেখাই—চাল ডাল আর পয়সা লিয়, টাকা তো লিয় না। তুই বিদেশী রাহী। তোকে ঠকিয়ে আমি টাকা কেনে লিবে বল?

শুকুর। না-না, ঠকিয়ে নিবি কেন, আমি তোকে খুসি হয়ে দেবো। এক টাকা নয়—অনেক টাকা, বুঝলি?

একাবতী। হুঁ, বুঝলম।

শুকুর। কি বুঝলি একা?

একাবতী। বুঝলম খেল দেখানো চল্‌বে না।

শুকুর। কেন?

একাবতী। আমি তোকে চিনতে পেরেছে।

শুকুর। একা!

একাবতী। তুই সেই শালা সাহেব।

শুকুর। বেদেনী—

একাবতী। ইয়াদ আছে শালা সাহেব—এক বরষ আগে তুই আমার বাপুজীকে বেইজ্জত করেছিলি—তাকে চাবুক মেরেছিলি—আর আমাকে বলেছিলি—তোকে সাদী করব।

শুকুর। এখনও বলছি চল আমার সঙ্গে, আমার গুলাব মহলে নিয়ে গিয়ে তোকে আমি সাদী করবো। [হাত ধরিতে উদ্যত]

একাবতী। হুঁসিয়ার শালা সাহেব! এখনও ইজ্জত লিয়ে—জান লিয়ে ঘরে যা, কেনে মরবি।

শুকুর। মরবো!

একাবতী। আলবৎ। আমার এই ঝাঁপিতে আছে কালনাগিনী—দাঁত দুটো তার বিষে ভরা—এখন যদি তাকে ছেড়ে দি, তাহলে—

শুকুর। বাজে কথা রাখ, এখনও বল আমার গুলাব মহলে যাবি কিনা?

একাবতী। না।

শুকুর। বেদেনী!

একাবতী। বেদেনী—তোর মাফিক জানোয়ারের গোঁসা দেখে, না—কে কখনও হ্যাঁ বলবে না।

শুকুর। তাহলে তোর শেষ কথা তুই যাবি না?

একাবতী। না।

শুকুর। তাহলে এক বছর ধরে যে খোয়াব আমি দেখে আসছি, সে খোয়াব আমার বরবাদ হয়ে যাবে? বিশ্বাস কর বেদেনী—তোকে পহেলা দেখার পর থেকে রাত্রে আমার নিদ আসে না।

একাবতী। একটা কাম কর শালা সাহেব।

শুকুর। বল বেদেনী, তুই আমার উপর খুসি হয়ে—যা বলবি আমি তাই করতে রাজী।

একাবতী। তোর গুলাব মহলের খোয়াব গুলজার করতে—সেখানে তোর নওজোয়ান বহিনকে লিয়ে যা।

শুকুর। কি বললি হারামজাদী! এতবড় কথা বলতে তোর সাহস হলো! চল শয়তানী—তোকে গুলাব মহলে নিয়ে গিয়ে—[ধরিতে উদ্যত]

একাবতী। পথ ছেড়ে দে জানোয়ার।

শুকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—জানোয়ারের কবলে আজ শিকার—[হাত ধরিল]

একাবতী। কে আছিস—আমাকে বাঁচা—আমাকে বাঁচা—

শুকুর। ভূখাঁ শেরের মুখে শির বাড়িয়ে দিতে, কোন বে-আদব আসবে?

লাঠি হাতে রাণার প্রবেশ।

রাণা। মানুষ।

শুকুর। [একাবতীর হাত ছাড়িয়া দিল] কে তুই বেয়াদব।

রাণা। বেয়াদব আমি না তুমি।

শুকুর। চোপরাও কমবক্ত!

রাণা। হুঁসিয়ার খাঁ সাহেব। হাতে যে লাঠিখানা দেখছো, দু-হাতে সাপটে ধরে দিই যদি তোমার মাথায় বসিয়ে, তাহলে দেখা যাবে তোমার ওই শয়তানীভরা মাথাটা ছাতু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে।

শুকুর। বটে, এত সাহস তোর! বাড়ী কোথায়?

রাণা। দেশে।

শুকুর। কোন দেশে?

রাণা। মক্কাতেও নয়—মদিনাতেও নয়, বাড়ী এই বাংলা দেশে।

শুকুর। বাঙালীর এত সাহস—

রাণা। এর আগে বাঙালী দেখনি বুঝি মিঞা? কোন মুল্লুকে জন্ম তোমার? মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে এখুনি নেমে আসছো আফ্রিকার জঙ্গল থেকে। মিঞাজান! সুদূর আফ্রিকা থেকে উড়ে এসে বাংলায় বেশী দাপাদাপি করো না। বাঙালী শান্ত জাত, দুদিন কিছুই বলবে না, তিন দিন পরে তাদের ঘুম ভেঙে গেলে—পটপট করে তোমাদের পা-গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।

শুকুর। কেন, তা দেবে কেন? আমি তো কোন বাঙালীর সঙ্গে বদমেজাজ করিনি, এই ঔরৎটাকে আমি সাদী করতে চাই।

রাণা। হবে না সাদী।

শুকুর। হবে না কেন? ও তো বাঙালীর ঔরৎ নয়,—যাযাবর বেদেনী।

রাণা। তবু ও বাস করে এই বাংলাদেশে, বাংলার ভাত খায়, বাংলা ভাষায় কথা বলে, পা ফেলে চলে এই বাংলার মাটিতে।

একাবতী। তুই ঠিক কথা বলেছিস জোয়ান—পাঁচ বরষ বয়েসে আমি আমার বাপুজীর সাথে তোদের বাংলা মুল্লুকে এসেছে। একা ওই চড়ক দীঘির পাড়ে ঘর বেঁধে বাস করে। বাপুজী ছিল, সেও এক বরষ হলো নাগের ছোবল খেয়ে মরে গেল। তবু এই বাংলার মায়া আমি কাটাতে পারিনি। তুই বল জোয়ান, কেনে ওই শয়তান আসবে আমার খুসির ঘর ভেঙে দিয়ে আমাকে বে-ইজ্জত করতে? কেনে? কেনে?

রাণা। জবাব দাও মিঞা! নইলে—

জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানেই হবে তোমার জীবন্ত কবর।

শুকুর। জীবন্ত কবর!

জয়ন্ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নীচে কাঁটা উপরে কাঁটা—তারপর তোমার বুকের রক্তে মাটি ভিজিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে তোমার কবরের ছাদ। মাটির ভিতরে গুমরে গুমরে তুমি কেঁদে উঠবে, খল খল করে হেসে উঠবে এই বেদেনী, শয়তান জানোয়ারের মত ত্রাহি-ত্রাহি চিৎকার করবে, তখন সেই চিৎকার শুনে তোমার মত শয়তানের দল আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

শুকুর। বাঙালী—

গীতকণ্ঠে কঙ্কালের প্রবেশ।

কঙ্কাল।—   গীত।

ফোঁস করো না।
টক টকে লাল—আগুন রাঙা লোহার কাঠি ধরো না।
ভুলের ফসল হচ্ছে জমা,
রাখবে কোথায়, নেই কো ক্ষমা,
দীলের লাগাম সামলে ধর খেয়ালে পাগলা ঘোড়ায় চড়ো না।

শুকুর। তুই আবার কে?

কঙ্কাল। আমি কঙ্কাল।

জয়ন্ত। কঙ্কাল!

কঙ্কাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমায় চিনতে পারলে না? আমার বাবার নাম ইতিহাস। বাংলাদেশটা হলো আমার মা।

শুকুর। একি রূপ তোর?

কঙ্কাল। এই তো বাঙালীর আসল রূপ। এ সবই তোমাদের গোপন কীর্ত্তি মিঞা।

জয়ন্ত। উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

কঙ্কাল। ভয় পেলে বুঝি? অমন করে দেখছো কি গো? আমি যে কঙ্কাল। তাই—

জয়ন্ত। তাই—

কঙ্কাল। তোমাদের কাছে এসেছি।

রাণা। কেন?

কঙ্কাল। জানো, তালুকদার কাজী হাসান খাঁ—

জয়ন্ত। হাসান খাঁ!

কঙ্কাল। তাকে নিয়েই তো এখন বড় ভাবনা, আর সব চেয়ে বেশী ভাবনার হলো তার শালা এই শুকুর খাঁকে নিয়ে।

শুকুর। চোপরাও বেয়াদব।

কঙ্কাল। বেয়াদব তোমার চৌদ্দপুরুষ। হুঁসিয়ার রাজকুমার! এদের মোটেই বিশ্বাস করো না। কারণ এর বোনাই হচ্ছে কাজী হাসান খাঁ। কাজী নামই পাজীভরা। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। তালুকদার হাসান খাঁর সম্বন্ধী তুমি?

শুকুর। তাতে হয়েছে কি।

রাণা। হয়নি—তবে হবে।

শুকুর। কি হবে?

রাণা। তোমার শাস্তি।

শুকুর। হুঁসিয়ার কাফের হিন্দু! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

রাণা। বটে রে শয়তান—[নিজ অস্ত্রে বাধা দিতে শুকুরের

অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল, রাণা হাসিয়া পতিত অস্ত্র কুড়াইয়া লইল] কি হলো মিঞা? এইবার দিই যদি এক ঘা বসিয়ে!

জয়ন্ত। থামো রাণা। বেচারার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, ওকে যেতে দাও। যাও মিঞা ঘরে যাও।

রাণা। ঘরে গেলে বিবিজান যদি জিজ্ঞাসা করে—মুখটা তোমার শুকনো কেন, তাহলে তুমি বলবে—শুধু মুখটা কেন, জানটাও শুকনো হয়ে যেত। বেঁচে গেছে শুধু মণ্ডলগাঁয়ের ছোট রাজকুমার জয়ন্ত পালের অনুগ্রহে।

শুকুর। মণ্ডলগাঁয়ের ছোট রাজকুমার!

জয়ন্ত। হ্যাঁ মিঞা। আমিও তোমাকে বলে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে এই নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে চেয়ো না। যদি আমার কথা না শোন, তাহলে আর ক্ষমা হবে না, হবে তোমার—

রাণা। মৃত্যু। বুঝলে মিঞা! আসুন কুমার—

জয়ন্ত। একটু দাঁড়াও।

রাণা। কেন?

জয়ন্ত। ওর তলোয়ারটা ফিরিয়ে দাও।

রাণা। ও হ্যাঁ—তাই তো। এই নাও। [শুকুর খাঁকে তলোয়ার দিল, সে তাহা লইল]

জয়ন্ত।
রাণা। } হাঃ-হাঃ-হাঃ—[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

একাবতী। এই রাহী! [উভয়ে ফিরিল]

জয়ন্ত। বল।

একাবতী। তোরা আমাকে তোদের দেশে নিয়ে চল।

রাণা। আরে এটাও তো আমাদের দেশ।

একাবতী। না-না, এখানে আমি থাকবো না। এখানে তোরা থাকিস না, আমার বড় ভয় করছে।

জয়ন্ত। রাণা!

রাণা। মেয়েটা ঠিকই বলছে কুমার! এখানে থাকা ওর পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। তার চেয়ে—

একাবতী। আমাকে তোরা লিয়ে চল।

জয়ন্ত। বেশ, তাই হোক। তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে এসো রাণা, আমি বৌঠানের সঙ্গে দেখা করিগে।

[প্রস্থান।

রাণা। যা বেদনৌ! সোজা রাস্তা ধরে চলে যা, দেখবি যেখানে একদল লোক একটা পাল্কীকে ঘিরে বসে আছে। ওইখানে যাবি, বুঝলি?

একাবতী। হ্যাঁ রে জোয়ান, আমি ঠিক বুঝেছি।

[খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

রাণা দাঁড়িয়ে কেন মিঞা? বাড়ী যাও। হাঁ করে দেখলে তো সব? ছিঃ-ছিঃ! এমন ময়ুর হাতছাড়া হয়ে উড়ে গেল! কি আর করবে মিঞা! এ তোমার দোষ নয়, তোমার নসীবের দোষ!

[প্রস্থান।

শুকুর। নসীব! নসীব! আমি ভেতো বাঙালী নই যে নসীবের উপর দোষ চাপিয়ে জুজুর মত বসে থাকবো। আমি হাবসী— নসীব আমার হাতের মুঠোয়। আমার নসীব আমি তাকত দিয়ে, মেহনত দিয়ে, কলিজার খুন দিয়ে পায়ের তলায় হাজির করবো। কাফের জয়ন্ত পাল, আমি তোমাকে বে-ইয়ার হবো না। যে

বসরাই গুলাব তুমি ছিনিয়ে নিয়ে গেলে, শীঘ্রই একদিন সে গুলাব আমার পায়ের তলায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে—তবেই আমি হাবসী—তবেই আমার নাম মহম্মদ শুকুর খাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তালুকদারের প্রাসাদ।

হোসেন খাঁর প্রবেশ।

হোসেন। শুকুর খাঁ—শুকুর খাঁ—আরে গেল কোথায় ছোকরা, সবের থেকে দেখছি না—তবে কি ভাইজান তাকে বাইরে পাঠিয়েছে—

দ্রুত শোভানা বানুর প্রবেশ।

শোভানা। বড়সাহেব কই—বড়সাহেব ?

হোসেন। কেন ভাবী ?

শোভানা। সৈন্য সাজাতে হবে।

হোসেন। এঁ্যা !

শোভানা। প্রতিশোধ চাই।

হোসেন। ভাবি!

শোভানা। এতবড় সাহস কাফের হিন্দুর—মসজিদকে করে এনকার—শুকুরকে করে বে-ইজ্জত—

হোসেন। ব্যাপারটা—

শোভানা। বুঝতে পারছো না। আমিও তো পারছি না—এত সাহস কোথায় পেয়েছে সেই শয়তান।

হোসেন। শয়তানটা কে ভাবী?

শোভানা। মণ্ডলগাঁয়ের ছোট রাজকুমার জয়ন্ত পাল।

হোসেন। কি করেছে সে?

শোভানা। ছোট সাহেব! এত কৈফিয়ত দেবার সময় আমার নেই। জানো না সে কি অপরাধ করেছে—খোঁজ রাখো না তালুকের মধ্যে কত অঘটন ঘটছে। কি করো দিন রাত?

হোসেন। হিসাব।

শোভানা। কিসের এত হিসাব ছোট সাহেব?

হোসেন। কাকে কবে কত কি দিতে হবে।

শোভানা। কি দিতে হবে?

হোসেন। যার যা নেই; অর্থাৎ অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, গৃহহীনকে গৃহ—

শোভানা। বাহবা ছোট সাহেব! এইসব করছো বুঝি?

হোসেন। হ্যাঁ, অনেকদিন থেকে।

শোভানা। পরের ধনে পোদ্দারী করে নাম কিনছো ছোট সাহেব? অথচ তোমারই এক আত্মীয়কে বে-ইজ্জত করে কাফের জয়ন্ত পাল হাসতে হাসতে নিজের মুল্লুকে ফিরে গেল, সে খবর তুমি রাখো না?

হোসেন। অত বাজে খবর যদি আমি রাখতে যাবো—তবে উজির-নাজির, পাইক পিয়াদারা আছে কি করতে? আমি—

শোভানা। থামো তুমি। ডাকো বড়সাহেবকে, জিজ্ঞাসা করবো তার তালুকে কি মুসলমানরা এমনি করে কাফের হিন্দুদের হাতে বে-ইজ্জত হবে?

হাসান খাঁর প্রবেশ।

হাসান। না শোভানা বেগম।

শোভানা। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

হাসান। বারুদখানায়।

শোভানা। শুনেছো সব ঘটনা?

হাসান। শুনেছি। শুনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই শোভানা, সিপাহশালারকে সংবাদ দিয়েছি।

হোসেন। ভাইজান!

হাসান। হ্যাঁ হোসেন! কাফের হিন্দুরা মনে করেছে, যে বাংলার সব মুসলমানেরা মরে গেছে। তাই তারা এত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। তাই এমনি ভাবে শুকুর খাঁকে অপমান করে, মুসলমানদের পবিত্র মসজিদকে এনকার করে—এক কসবী বেদনীকে তারা আমার তালুক থেকে নিজের মুলুকে নিয়ে গেছে। তুমি প্রস্তুত হও হোসেন, হয়তো এ যুদ্ধের মহড়া তোমাকেই নিতে হবে।

হোসেন। তুমি—

হাসান। পাগল হয়ে গেছি হোসেন।

শোভানা। আমি—

হাসান। হারেমে যাও শোভানা। এ বে-ইজ্জত শুধু তোমার

ভাইয়ের নয়, তামাম ইসলাম দুনিয়ার বে-ইজ্জত। আমি এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো।

হোসেন। কিন্তু—

হাসান। কিন্তু কিসের হোসেন?

হোসেন। আমার—

শোভানা। বিশ্বাস হচ্ছে না?

হোসেন। ঠিক তাই।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। ভাইজান। ঘটনা তদন্ত কর। আগে জানো এ সত্য না মিথ্যা। না হলে চিলে কান নিয়ে গেছে ভেবে তার পেছনে পেছনে দৌড়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না।

হাসান। কি বলতে চাও তুমি?

শোভানা। ভাইজান তোমায় বলতে চায়—হিন্দুদের পায়ের তলায় মাথা পেতে দাও, নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়ে সাকর মল্লিক—দবির খাস, আর কাজী হারেশের মত হরিনামের দরিয়ায় ভেসে যাও।

হোসেন। গোসা করো না ভাবী! তুমি যা বললে, আমি তার খোয়াবও দেখি নাই। আমি শুধু বলতে চাই—

শোভানা। থামো তুমি। কোন কথা তোমার শুনতে চাই না। বড় সাহেব! বল, জয়ন্ত পাল যে বে-আদবী করে গেছে, তার প্রতিকার হবে কি না?

শুকুর খাঁর প্রবেশ।

শুকুর। না। দরকার নেই তার প্রতিকারে—আমি বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছি শোভানা।

শোভানা। তাই যাও ভাইজান, তাই যাও। যেখানে ঘরে ঘরে এমন বেইমানী—যেখানে মোল্লা মৌলভীরা বে-ইজ্জত হয়, সেখানে তোমার থাকা উচিত নয়। কি বলবো বাপজানকে, বাংলায় এসে সেও—

গহরজানের প্রবেশ।

গহর। বাঙালী হয়ে গেছি বেটি! এমন বেহেস্তি দেশ দুনিয়ায় আছে নাকি? এখানে আসবার আগে খোয়াবেও দেখিনি—মাঠ-ভরা ফসল, দরিয়া ভরা পানী, দিকে দিকে সবুজের কেয়ারী। মাটি তো নয়, যেন সোনা! এই সোনার সামিল মাটিতে দাঁড়িয়ে খোদাকে ডাকতে ভুলে যাই।

শোভানা। চুপ কর বাপজান!

গহর। মিথ্যে বলিনি বেটি, এক বর্ণ—এক হরফ বাড়িয়েও বলিনি। বাংলার মত দেশ, বাঙালীর মত জাত, বাংলার মত এমন মিঠে ভাবা আমি জিন্দেগীভর কোথাও দেখিনি।

হোসেন। কি বলছেন আপনি?

গহর। আহা, মাথার উপর নীল আসমান, পায়ের নীচে নরম জমিন, গাছে গাছে পাখির ডাক—রামের হাত ধরে রহিম চলছে, মসজিদের পাশে মন্দির উঠছে। খোদা! দুনিয়ার মালিক, আবার যদি আমাকে দুনিয়ায় পাঠাও, তাহলে এই বাংলায় পাঠিয়ো মেহেরবান!

শোভানা। বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

গহর। কেন রে শোভানা? হলো কি?

শোভানা। বাংলা! বাংলা! বাংলা! বাংলার নামে লাজ

পড়ছে। খবর রাখো, তোমার ছেলেকে এক কাফের হিন্দু চাবকে দিয়েছে ?

গহর। কে সে বেকুব, দেখা হলে বলতাম এর মাথাটাও নিয়ে যাও।

হাসান। এ আপনি কি বলছেন ?

গহর। বাঙালীরা যাকে চাবুক মারে—বুঝতে হবে তার জান নেওয়াই উচিত ছিল বাবাজী।

শুকুর। বাপজান।

গহর। চোপরাও হারামজাদা! একি তোর জঙ্গলেভরা অবিসিনিয়া। পায়ে পায়ে পাথর—গাছে গাছে বাঁদর ? এ বাংলা, তুনিয়ার সেরা দেশ—এর মাটি মক্কাতীর্থের সামিল। এ দেশের মানুষের কলিজায় তোর মত সিম্পাঞ্জীর রক্ত নাই, আছে দেবতার রক্ত—বুঝলি ?

হোসেন। আপনি বাইরে চলুন, এরা কেউ আপনার কথার মূল্য দেবে না।

শোভানা। কেন দেবো শুনি ? জিন্নতযাত্রী এক বৃদ্ধের কথার কতখানি মূল্য থাকতে পারে ?

গহর। কি বললি শোভানা! এতবড় বুকের পাটা তোর—

হাসান। যান—যান, আপনি এখানে মাথা গলাতে আসবেন না।

গহর। বেশ চললাম। বুড়ো মানুষ আমি, গলাবার মত তাকৎ এ মাথায় আর নেই। তবে হ্যাঁ বাবাজী, এই কথাটাই শুধু বলে যাই—যারা ঔরৎদের কথা শুনে তালুক মুলুক চালাতে যায়, তাদের উচিত ফকিরী নিয়ে পথে নেমে যাওয়া।

শুকুর। }
শোভানা। } বাপজান !

গহর। ওরে বে-শরমের দল! তোদের মত বহু বিদ্রোহীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলো এই বাংলাদেশে। তাদের পরিনামটা কি হয়েছিল সেই কথাটা ইয়াদ রাখিস।

[প্রস্থান।

হাসান। কয়েকটা মুসলমানের মৃত্যুতে বেওকুব হিন্দুগুলো মনে করেছে যে তামাম মুসলমানের মৃত্যু হয়েছে। না তা হয়নি, তালুকদার কাজী হাসান খাঁ এখনও জীবিত। তাই তারা যে ভুল করে গেছে আমি তা করব না। বৃক্ষ জন্মাবার আগেই মূল সমেত উপড়ে ফেলবো। হোসেন—

হোসেন। ভাইজান!

হাসান। তুমি প্রস্তুত?

হোসেন। আলবৎ—

হাসান। কি করতে হবে জানো?

হোসেন। জানি।

শোভানা। তাহলে তুমি নিজে যুদ্ধে যাবে ছোট সাহেব?

হোসেন। না ভাবী।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। উত্তেজিত হয়ো না ভাইজান, স্মরণ রেখো—বাংলায় শুধু মুসলমানরাই বাস করে না, হিন্দুরাও বাস করে।

শুকুর। তালুকদার হাসান খাঁ সামান্য ক'টা হিন্দুর ভয়ে ভীত—

হোসেন। না-না, ভীত কেন—আর ভয়ই বা কিসের? তবে কত বাদশা-সুলতান-নবাব-জায়গীরদার হিন্দুদের সঙ্গে তারা শক্রতা

পোষণ করেই গেল—তুমি একবার অন্য রকম করে দেখ তারা পোষ মানে কি না।

হাসান। অন্যরকম মানে—

হোসেন। তাদের সঙ্গে দোস্তি করো।

শুকুর। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের দোস্তি!

হোসেন। দোষ কি শুকুর খাঁ? তারাও তো মানুষ—মানুষের সঙ্গে দোস্তি মানুষেই করে।

শুকুর। হিন্দুরা আবার মানুষ!

হোসেন। অন্তত তোমার মত অমানুষ নয় মিঞা।

শোভানা। বড়সাহেব! এমনি করে তোমার ভাইও আমার ভাইকে বে-ইজ্জত করবে? থাকো তুমি তোমার ভাইকে নিয়ে, আমি তোমার মহল থেকে চলে যাচ্ছি—

হাসান। বেগম!

শোভানা। এমন আমার নসীব! আমার ঘরে আমি একটা কথা বলতে পারবো না—এর চেয়ে বাপজান যদি আমাকে কুলী-মজুরের হাতে তুলে দিত—

হোসেন। ভাবী! চোখের পানী ফেলে ফয়দা তেমন হবে না। যাকে তুমি উত্তেজিত করছো—সে তোমার স্বামী হবার আগে আমার ভাই। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক রক্তের—তোমার ওই চোখের পানীতে আমাদের রক্তের বাঁধন ছিঁড়ে দিতে পারবে না।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। যদি তা পারে তাহলে জানবো, খোদাতালার এই দুনিয়ায় রক্তের চেয়ে, ভাবীর চোখের পানীর দাম বেশী ভাইজান!

[প্রস্থান।

শোভানা। ভাইজান, চলে এস আমার সঙ্গে।

হাসান। না শোভানা। তোমার সঙ্গে ও যাবে না—ও যাবে মণ্ডলগাঁয়ে—

শুকুর। } এ্যাঁ!
শোভানা। }

হাসান। হ্যাঁ। আমার এত্তেলা নিয়ে কালই যাত্রা করবে, রাজা নরপালের কাছে। এত্তেলা তাকে দেবে আর মুখেও বলবে, যে ঔরৎকে তার ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, তাকে যেন তোমার সঙ্গেই আমার দরবারে পাঠিয়ে দেয়। যদি পাঠিয়ে দেয়—উত্তম—

শুকুর। যদি না দেয়?

হাসান। তাহলে তার আমার দুজনের রাজ্যের সীমান্তে বেজে উঠবে যুদ্ধের দামামা। তাতে যদি নবাব নসরৎ শাহ আসে আমাকে বাধা দিতে, আমি তাকেও মুসলমান বলে খাতির করবো না, কাফের নবাব হুসেন শাহের আমল থেকে বাংলায় ইসলাম ধর্ম্মের যে বে-ইজ্জত চলেছে—সেই বে-ইজ্জতের বদলা নিতেই আমি রক্তের দরিয়া বইয়ে দিয়ে সেই মাটিতেই আমি কবর দেবো তামাম হিন্দুকে, আর সেই কবরে উড়িয়ে দেবো বাংলায় ইসলামী ঐক্যের উদ্ধত নিশান। [প্রস্থান।

শোভানা। ভাইজান!

শুকুর। এ্যাঁ!

শোভানা। কি ভাবছো তুমি?

শুকুর। ভাবছি, হোসেন খাঁর বড় বাড় বেড়ে গেছে—

শোভানা। ঠিক বলেছো—বড়সাহেবও তার উপর বেশ দুর্ব্বল; তবে হ্যাঁ—এ দুর্ব্বলতা বেশীদিন থাকবে না—

শুকুর। কি করে বুঝলি ?

শোভানা। বুঝবো আবার কি, ওদের ওই সামান্য দুর্ব্বলতা যদি ঘুচিয়ে দিতে না পারি, তাহলে মিছেই দুনিয়ার মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি।

শুকুর। কিন্তু বাপজানও লোক ভাল নয়।

শোভানা। তাকে আমি বঝিয়ে বলবো এখন।

শুকুর। হুঁ—তোর সামনেই তো হোসেন খাঁ আমাকে অমানুষ বললে।

শোভানা। বলুক বেওকুব—দু'রোজ পরে দেখবো কোথায় থাকে তার দরদভরা দীল—ইমানভরা জান। তুমি শুনে রাখো ভাইজান, আখেরে তাকে যদি শায়েস্তা করতে না পারি তাহলে মিছেই আমার নাম—শো—ভা—না—বা—নু।

[প্রস্থান।

শুকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আগুন জ্বলে উঠেছে। বেতমিজ বে-আদব জয়ন্ত পাল! এইবার দেখবো সেই বশরাই গোলাপ কেমন করে বাগিচায় সাজিয়ে রাখো। গোলাব একাবতী, শয়তান জয়ন্ত পাল, আর—আরও একটা জওয়ানকে আমি দেখবো, তার নাম রা—ণা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঈশান কৈবর্ত্তের বাড়ী।

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। না, হতভাগা ছোঁড়া আজও বাড়ী ফিরলো না। পাঁচ দিনের সময় নিয়ে আজ পনেরো দিন হয়ে গেল, তবু তার দেখা নেই। তখনি বলেছিলাম যাসনি হতভাগা, ময়নার সিংহি কি এখেনে—কত নদ-নদী পেরিয়ে তবে সে রাজ্যি, তা শুনলে সেকথা? চুলোয় যাক, আমার কি, কষ্ট তোরই হচ্ছে আমার তো নয়—

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদেরচাঁদ। রাণা! রাণা! এ হতভাগা রাণা! দেখ দেখি, ডাকলে সাড়া দেয় না! ছোঁড়া হাড়ে হাড়ে বজ্জাত—জেলের ছেলে তো, কত আর বুদ্ধি হবে—

ঈশান। তুমি কোন বামুনের ব্যাটা?

নদেরচাঁদ। এই দেখ দেখি কাণ্ড! আরে তুই বাড়ীতে আছিস, তা সাড়া দিবি তো—তুই সাড়া দিলে কি ও কথাগুলো আমি বলতাম? যাকগে যাক, কিছু মনে করিস না—মাছ দে।

ঈশান। মাছ!

নদেরচাঁদ। এই দেখ কাণ্ড—বলি মাছের নাম শুনে চোখ দুটো যে কপালে তুললি—মাছ মানে মাছ। রুই, কাতলা, সোল, বোয়াল, কই, মাগুর, এমন কি চুনো পুঁটি যদি থাকে তাই দে।

ঈশান। কোন মাছ নেই।

নদেরচাঁদ। নেই? বলি জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিলি নাকি?

ঈশান। জাত-ব্যবসা ছাড়বো কেনে, শরীলটা কদিন ভাল যাচ্ছে না—

নদেরচাঁদ। এই দেখ কাণ্ড! তা যাবি তো আমার কাছে, খাবি তো একটা বৃহৎ হস্তিদন্ত চূর্ণের পুরিয়া।

ঈশান। তোমার পুরিয়া খেলে ব্যামো কমে না বাড়ে।

নদেরচাঁদ। বাড়বেই তো—প্রথমে বেড়ে শেষে একেবারে—

ঈশান। পটল পয়সা সের।

নদেরচাঁদ। মানে?

ঈশান। কেনে ঝামেলা করছো। আমার কোন ব্যামো হয়নি, মনটা খারাপ—ছোঁড়াটা ক'দিন হলো বাড়ীছাড়া, তাই—

নদেরচাঁদ। বল সেকথা—কোথায় গেছে রাণা?

ঈশান। ময়নার সিংহি।

নদেরচাঁদ। কার সিংহি?

ঈশান। ময়নার সিংহি গো।

নদেরচাঁদ। সে আবার কি কথা?

ঈশান। তা জানি না বাপু। নদীতে খেয়া দিয়ে সেদিন ঘরে এলাম, আসতেই রাণা বললে—দাত্ব, ছোট রাজকুমারের সঙ্গে ময়নার সিংহি চললাম বৌরাণীকে আনতে—

নদেরচাঁদ। তাই বল ব্যাটা জেলে, সে ময়নার সিংহি নয়—

ঈশান। তবে কার সিংহি?

নদেরচাঁদ। কারও সিংহি নয়। সে একটা রাজ্যি, তার নাম হচ্ছে ময়মনসিংহ।

ঈশান। সে দেশটা কতদূরে?

নদেরচাঁদ। অনেক দূরে।

ঈশান। দেখ দেখি কাণ্ড! দূরের পর দূর, তার চেয়েও দূরের রাজ্যি সেই ময়নার সিংহি। কতবার বলেছি, আমার নাম ঈশেন চন্দর কৈবত্ত। তিন কুড়ি বিঘে জমি, তার নাতি তুই—তোকে কেনে পরের চাকরি করতে হবে। চাষ-বাস কর, মাছ-টাছ ধর—টুকটুকে একটা বৌ এনে দি, তার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমো। তা শুনবে সেকথা?

নদেরচাঁদ। শুনবে কি করে? দু' কলম লেখাপড়া শিখে বিত্তের জাহাজ হয়েছে যে। আর রাজার ছোট ছেলে জয়ন্ত, সে হয়েছে মনিব। তার সাহসে বুক ফুলিয়ে তোর নাতি আমাকে পর্য্যন্ত অপমান করে। এসব কি ভাল কথা বলছিস ঈশেন?

ঈশান। কি আর বলি বল।

নদেরচাঁদ। তা বলবি কেন? ব্যাটা জাতে তো জেলে, বাপ-চৌদ্দপুরুষ মরেছে মাছ ধরে—গায়ে এখনো মেছো গন্ধ—

ঈশান। কি!

নদেরচাঁদ। তুই বল ঈশেন, তোদের ছেলেপুলেরা মাছ ধরবে, মদ খাবে, মেয়েমানুষ নিয়ে—

ঈশান। মাতামাতি করে চিরকাল ছোটলোক হয়ে থাকবে, আর তোমরা তাদের মাথায় পা দিয়ে সুখে রাজ্যি করবে, কেমন?

নদেরচাঁদ। এই দেখ কাণ্ড! আমি সেকথা বলছি?

ঈশান। যাও বাপু যাও, ওসব চালাকি ঈশেন কৈবত্ত বোঝে। খাতির করে এতদিন কিছু বলিনি বলে কুকুরের মত লাই পেয়ে মাথায় উঠে পড়েছ।

নদেরচাঁদ। কি বললি ঈশেন?

ঈশান। থামো মশাই, থামো। বেশ করেছে বিদ্যে শিখেছে, হাজারবার চাকরি করবে, তোমার তাতে কি? আমার নাতি সে যা খুসি তাই করবে।

নদেরচাঁদ। বড় বাড় বেড়েছিস ঈশেন, যা খুসি তাই করবে, এঁ্যা!

ঈশান। একশোবার করবে। তোমাদের ভদ্দরলোকের মান রাখতে গিয়ে আমাদের চৌদ্দপুরুষের মান তোমাদেরই পায়ের তলায় বিকিয়ে দিয়েছি। তাই বলে কি আমাদের নাতিপুতিরাও তাই করবে ভাবছো?

অগ্রে রাণা ও পশ্চাতে সাপের ঝাঁপি মাথায়
ডুগডুগি হস্তে একাবতীর প্রবেশ।

রাণা। না।

ঈশান। কে, রাণা? ফিরে এসেছিস ভাই! আয়—আয়, তোর জন্যে ভেবে ভেবে পাঁচদিন নাইনি, তিনদিন খাইনি। দোমরা জালখানা যেমন তোলা ছিল তেমনি তোলা আছে, পোষা বেড়ালটাও আজ তিনদিন ভাত পায়নি। [সহসা একাবতীকে দেখিয়া] ওই মেয়েটা কে রে দাদা?

রাণা। একটা মেয়ে।

নদেরচাঁদ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি ভায়া! কোথাকার মেয়ে, কার মেয়ে?

ঈশান। ওর মাথায় ওগুলো কি?

একাবতী। ঝাঁপি।

ঈশান। ঝাঁপি!

রাণা। হ্যাঁ, সাপের ঝাঁপি।

ঈশান ।
নদেরচাঁদ । } এঁ্যা—সাপের ঝাঁপি ?

একাবতী । হঁ্যা রে বুড়া ! তোরা যাকে সাপ বলিস, আমরা তাকে নাগ বলে । এগুলান নাগের ঝাঁপি, এর ভিতর কেউটে, গোখরো, ডোমনা, চিতি, চন্দ্রবোড়া কত রকম নাগ-নাগিনী আছে ।

ঈশান । ওরে ও রাণা ! সাপের ঝাঁপি আমার বাড়ীতে কেনে, সাপগুলো কামড়ায় না তো ?

একাবতী । কামড়ায় না, দংশে দেয় ।

নদেরচাঁদ ।
ঈশান । } এঁ্যা—দংশে দেয় !

একাবতী । হঁ্যা রে বুড়া, দংশে দেয় ; কিন্তু বিষ হয় না । আমি ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে সব বিষ গেলে লিয়েছে ! দেখবি একটা কালকেউটে ?

ঈশান । ওরে ও রাণা, কি করতে এ নাগকন্যেকে ঘরে নিয়ে এলি ?

রাণা । না এনে উপায় ছিল না দাদু !

একাবতী । এ ছোকরা, ওই বুড়া তোর দাদাজী হয় ?

রাণা । হঁ্যা ।

একাবতী । এ বুড়া, আমি তাহলে তোকে দাদাজী বলবে ।

নদেরচাঁদ । হঁ্যা রে রাণা, এ মেয়েটা এখানে থাকবে ?

রাণা । হঁ্যা । তালুকদার হাসান খাঁর সম্বন্ধী ওর উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল । ঠিক সেই সময়—

একাবতী । রাজকুমার আর এই ছোকরা সেখানে গিয়ে পড়ল, তাই আমি ইজ্জত লিয়ে এ মুল্লুকে চলে আসলাম ।

নদেরচাঁদ। তা বেশ করেছিস, ছোঁড়াটার একটা হিল্লে হলো!

রাণা। তার মানে?

নদেরচাঁদ। এই দেখ কাণ্ড! মানেটা আবার খুলে বলতে হবে ভায়া? তুই যেমন ছোকরা, ও তেমনি ছুকরী, কাজেই—

রাণা। বেরিয়ে যাও।

নদেরচাঁদ। এ্যাঁ!

ঈশান। এই মুহূর্ত্তে।

নদেরচাঁদ। বলছিস?

রাণা। খবরদার তুমি আমাদের বাড়ী আসবে না।

নদেরচাঁদ। সেকি রে রাণা! তোদের বাড়ী আসব না কি, আমার যে দৈনিক মাছের দরকার।

ঈশান। কই, এতদিন তো মাছের দরকার হয়নি?

নদেরচাঁদ। এতদিন পেটের গোলমাল ছিল। দুদিন বৃহৎ হস্তি-চূর্ণ বটিকা খেয়ে একেবারে বিলকুল পরিষ্কার।

রাণা। যাবে কিনা?

নদেরচাঁদ। যাবো ভায়া, যাবো। তোরা এলি—একটু বস, দুটো গল্প-টল্প—

একাবতী। দাদাজী! এ বুড়া কে বটে?

নদেরচাঁদ। এই দেখ কাণ্ড! আজ এলি, কালই জানতে পারবি আমি কে। আর বুড়ো বলিস কেন, তেলের দোষে চুল কটা না হয় আধপাকা হয়েছে। তাহলেও বয়েস আমার খুব বেশী নয়, ওই ঈশেন জানে—

ঈশান। আড়াই কুড়ি পেরিয়ে গেছে।

নদেরচাঁদ। তুই ব্যাটা জেলে কিনা।

রাণা। দাদু! বল, তুমি মাছ ধরা ছাড়বে কিনা?

ঈশান। ছাড়লাম।

রাণা। মাছ বিক্রি বন্ধ করবে কিনা?

ঈশান। করলাম।

নদেরচাঁদ। তবু বামুন কায়েত হওয়া যাবে না, আর তোদের গা থেকে মেছো গন্ধও ঘুচবে না। তা যাক, তোদের তো একটাই ঘর, তা মেয়েটি থাকবে কোথা—

ঈশান। তাইতো রে রাণা, কথাটা তো এতক্ষণ খেলাল হয়নি। হাজার হোক, সোমত্ত মেয়ে—তার উপর—

নদেরচাঁদ। দেখতে শুনতে খাসা। এক কাজ করলে পারিস, আমার তো প্রকাণ্ড বাড়ী, ঘরও সাতখানা। একখানা না হয় দেবো'খন খুলে, রাত্রে পঠিয়ে দিস।

একাবতী। আমি কিন্তু কালকেউটের ঝাঁপি সাথে করে নিয়ে যাবে।

নদেরচাঁদ। ওরে বাবা, না-না। সেকি কথা, তা কখনও হয়? ওরে বাপরে, কেউটের রাজা কালকেউটে, আধহাত তার ফণা একবার ছুবলে দিলে আর রক্ষে নেই। না ঈশেন, আমার কোন ঘর খালি নেই, সব ঘর ভর্ত্তি। খবরদার পাঠাসনি, আর তোর নাতীটাকেও সাবধান করে দিস, এ মেয়ে নয়—সাক্ষাৎ কালনাগিনী, দেবে কোনদিন ছোবল মেরে। ও ছোঁড়া তো মরবেই, তুই ব্যাটা জেলেকেও মরতে হবে।

[প্রস্থান

একাবতী। বুড়া ভয়ে পালিয়ে গেল। [হাসিতে লাগিল]

রাণা। এই হাসছো কেন?

একাবতী। হাসবে না?

রাণা। না। এক দেশ থেকে আর এক দেশে এলে—নতুন দেশ, অচেনা লোক, এত হাসি কি ভাল?

একাবতী। কেনে না ভাল রে ছোকরা! আমি তো সাঁঝে সবেরে দেশে ভিনদেশে সবখন হাসি করে। তোদের এ দেশটা আমার বহুৎ ভাল লাগছে, ভাল লাগছে দাদাজীকে। চল দাদাজী! আমি কোথা এই নাগ-নাগিনীর ঝাঁপি রাখবে দেখিয়ে দিবি চল।

ঈশান। রাণা!

রাণা। বল।

ঈশান। সত্যিই কি মেয়েটা আমার বাড়ীতে থাকবে?

রাণা। হঁ্যা। যতদিন না ওর ঘর তৈরী হয়, ততদিন থাকবে—ছোট রাজকুমারের হুকুম।

ঈশান। জানি না ভাই, তোদের হুঁস গেয়ান কেমন। সাপের সঙ্গে খেলা করে, মাথায় নিয়ে আদর করে চুমো খায় যে মেয়ে—তাকে আনলি ঘরে? না-না, এ আমি ভাল বুঝছি না দাদা, এ মেয়ে যে-সে মেয়ে নয়, সামাল দিয়ে রাখিস। বেশী দিনও থাকতে আসেনি। তবু যে ক'দিন থাকে, তারই মাঝে কোন অঘটন ঘটিয়ে না বসে।

একাবতী। আমাকে দেখে ভয় করছিস দাদাজী?

ঈশান। না-না, ভয় কিসের দিদি! দাদাজী যখন বলেছিস তখন তোকে দিদিভাই বলেই জানব। তবে তোর কাছে আমি বলে রাখছি দিদি, আমার এই নাতী বড় কেমন-কেমন, কারও কথা শোনে না—ফট করে ভদ্দরলোকের অপমান করে বসে। তুই যেন ওর কাছ থেকে বেশ কিছুটা তফাতে থাকিস—বেশ কিছুটা সমঝে চলিস। [প্রস্থান।

[একাবতী তীর্য্যক চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।]

রাণা। এই আবার হাসছো ?

একাবতী। আলবৎ হাসবে।

রাণা। কি, মুখের উপর জবাব ?

একাবতী। কেনে না জবাব দিবে রে ছোকরা ? তোকে আমি চিনে লিয়েছে। তোর মুখ দেখে, বুক দেখে, বাতচিৎ আর চোখ দেখে আমি বুঝেছে, তুই একটা পাগলা বটে !

[হাতের ডুগডুগি বাজাইয়া প্রস্থান।

রাণা। পাগল এতদিন ছিলাম না, পাগল করবে এবার তালুকদার হাসান খাঁর সম্বন্ধী শয়তান শুকুর খাঁ। তার হাতের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি জব্বর শিকার। সে কি সহজে ছেড়ে দেবে ? মোটেই না। তালুকদারের দরবারে এতদিন হৈ-চৈ কাণ্ড হচ্ছে, আর জানোয়ার শুকুর খাঁ—ভগ্নিপতির কাছে সাধু সেজে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বিশখানা করে লাগিয়ে—যার জন্য গোপনে বসে আফশোষের নিশ্বাস ফেলছে, তার নাম নাগিনীকন্যা একাবতী।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মণ্ডলগাঁর রাজপ্রসাদ।

মঞ্জুরীর প্রবেশ।

মঞ্জুরী। একাবতী! একাবতী! একাবতী! কোথাকার কে বেদিনী একাবতীর চিন্তায় তিনি আমাদের অস্থির। চান করার সময় নেই, খাবার সময় নেই—বিশবার ডেকে একবার সাড়া তাও পাওয়া যায় না। তবে কি সে বেদের মেয়ে একাবতীর—

জয়ন্ত পালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। প্রেমে পড়েছে! কেমন তাই না?

মঞ্জুরী। তুমি!

জয়ন্ত। হ্যাঁ, তোমার কথাটা আমিই শেষ করে দিলাম মঞ্জুরী।

মঞ্জুরী। আমি—

জয়ন্ত। ভাবতেই পারোনি যে এ সময় আমি এসে পড়বো।

মঞ্জুরী। কিন্তু—

জয়ন্ত। জানলে হয়তো কথাটা বলতে না!

মঞ্জুরী। কেন বলতাম না, একি নতুন কথা? শুধু আমি নয়, অনেকেই বলছে—

জয়ন্ত। রাজার ছোটছেলে বেদনীর প্রেমে পড়েছে; কিন্তু তাই বলে আমার স্ত্রী হয়ে সেকথা তুমিও বলবে?

মঞ্জুরী। কথাটা কি মিথ্যা?

জয়ন্ত। একশোবার।

মঞ্জুরী। না, মিথ্যা নয়।

জয়ন্ত। মঞ্জুরী!

মঞ্জুরী। হ্যাঁ, আমি ভালভাবে লক্ষ্য করেছি—যেদিন থেকে তুমি একাবতীকে নিয়ে এসেছো, সেইদিন থেকেই তোমার অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হয়েছে।

জয়ন্ত। হওয়াই স্বাভাবিক।

মঞ্জুরী। কেন স্বাভাবিক? সে তোমার কে? কিসের সম্বন্ধ তার সঙ্গে তোমার? দিন নেই, রাত নেই—কেবল একাবতী আর একাবতী! কি ভেবেছো তুমি?

জয়ন্ত। অনেকদূর এগিয়েছো মঞ্জুরী। তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—তুমি আমার স্ত্রী।

মঞ্জুরী। আমিও তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি—তুমি রাজার ছেলে, একটা সাধারণ মানুষের যা সাজে তোমার তা সাজে না। জেলের বাচ্ছা রাণার সঙ্গে কিসের এত ঢলাঢলি? কেন সে যখন তখন তোমার কাছে আসে? এতবড় একটা রাজা, সেই রাজার ছেলের কোন সম্ভ্রম বোধ নেই? আভিজাত্য নেই?

জয়ন্ত। এত কথা কবে শিখলে মঞ্জুরী? দু'বছর হলো তুমি এসেছ, দশ বছর ধরে দেখে আসছি বৌদিকে! কই তার মুখে একথা তো কোনদিন শুনিনি?

মঞ্জুরী। শুনবে কোত্থেকে? তোমার বৌদি সাধারণ ঘরের মেয়ে, কপাল জোরে রাজবাড়ীর বৌ হয়েছে। আমি তো আর তার মত ছোটঘরের মেয়ে নই।

জয়ন্ত। মঞ্জুরী! সাহস তোমার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ভুলে যেও না—বৌদিকে আমি ভক্তি করি—শ্রদ্ধা করি।

মঞ্জুরী। আহা, কি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, তবু যদি কোন রাজকন্যা হতো! স্বামী তো দু'চোখে দেখতে পারে না—আর পারবেই বা কি করে? হাজার হোক বড়ঠাকুর রাজার ছেলে, ছোটলোকের মেয়ে নিয়ে তার ঘর করতে ভাল লাগে?

জয়ন্ত। মঞ্জুরী!

মঞ্জুরী। কি, তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছো—

জয়ন্ত। মন যে রাঙাতে পারলো না, চোখ রাঙানী ছাড়া সে পাবে কি!

মঞ্জুরী। সে তো ঠিক কথা। এবার বেদেনী পেয়েছো—মন সেই রাঙিয়ে দেবে—

জয়ন্ত। আর একবার বল—

মঞ্জুরী। বললে মারবে বোধ হয়? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! কি ঘেন্নার কথা! রাজার ছেলে হয়ে ছোটলোকের মত—

জয়ন্ত। তোমাকে এখনও সসম্মানে প্রাসাদে স্থান দিয়েছি—নীরবে মাথা পেতে দু'বছর তোমাকে নিয়ে সংসার করছি। নইলে যে সম্ভ্রম আর আভিজাত্যের কথা একটু আগে তুমি বললে, সেই সম্ভ্রম এবং আভিজাত্য অটুট অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে আমার প্রথম উচিত—

শিকারিণীর প্রবেশ।

শিকারিণী। নিজে ছোট হয়ে অপরকে বড় করে তোলা।

জয়ন্ত। বৌদি!

শিকারিণী। তোমরা দু'জনে আছো—অথচ আমি এলাম—এ আসা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয় ভাই।

জয়ন্ত। তাতে কি হয়েছে।

শিকারিণী। মঞ্জু বোধহয় ভাবছে। [মঞ্জুরীকে দেখিয়া] একি রে মঞ্জু, তোর চোখ-মুখ এত লাল কেন? থর থর করে কাঁপছিস—দেখে মনে হচ্ছে ঝগড়া করেছিস। কি হলো?

মঞ্জুরী। জানি না।

শিকারিণী। ঠাকুরপো! তোমাকে দেখছি বিষণ্ণ। বল তোমাদের কি হয়েছে?

জয়ন্ত। কিছু না।

শিকারিণী। সে কি! মঞ্জু বললে জানি না, তুমি বলছো কিছু না, অথচ—

মঞ্জুরী। সব কথায় তোমার এত খোঁজ কেন দিদি? এতবড় প্রাসাদে এখানে ছাড়া ঠাঁই নেই? আর কোন কাজ নেই তোমার?

শিকারিণী। এও যে আমার একটা বড় কাজ রে মঞ্জু! তোরা দু'জনেই আমার ছোট, সংসারে শাশুড়ী নেই, আমি বড়—তোদের সুখ-দুঃখের খোঁজ যে আমাকেই রাখতে হবে বোন।

মঞ্জুরী। খুব হয়েছে দিদি, কথায় তোমাকে পারবো না আর অভিনয়েও তোমার জুড়ি নেই—

জয়ন্ত। মঞ্জুরী! ধৈর্য্যের বাঁধ পাষাণ দিয়ে গড়া নয়।

শিকারিণী। ছিঃ ভাই! উত্তেজিত হওয়া কি তোমার সাজে? তুমি পুরুষ, সংসারের নানান ঝড় যে তোমাদেরই মাথায় করে বইতে হবে। মঞ্জু ছোট, সংসারের ও কিছুই বোঝে না, কাকে কি বলতে হয় তাও এখন শেখেনি। তাই বলে—

জয়ন্ত। তোমার সামনে তোমার নিন্দে করবে?

শিকারিণী। তবে আর ছোট বলছি কেন?

জয়ন্ত। আমার সম্মুখে তোমাকে যা-তা বলবে ?

শিকারিণী। ওকি সব কথার অর্থ বোঝে ভাই! তা ছাড়া যাকে বলছে সে তো কিছুই কু মনে করেনি।

জয়ন্ত। তুমি যদি এখন সাগর হও—

শিকারিণী। তোমরাও হবে নদী।

জয়ন্ত। বৌদি!

শিকারিণী। আমি বড় সাগর, তোমরা দু'জনে ছোট নদীর মত উচ্ছল কলতানে সংসার-তীর মুখরিত করে আমার বুকেই আশ্রয় নেবে। [মঞ্জরীর হাত ধরিয়া] মঞ্জু! কি হয়েছে বল, কি তোর নেই, কোথায় তোর অভাব। আমি কথা দিচ্ছি, সব অভাব তোর পূরণ করবো।

মঞ্জরী। থাক দিদি, খুব হয়েছে। আমার অভাব কিছুই নেই, তোমার সোহাগের দেওরের অনেক অভাব—যদি পারো—কথা বলে অভিনয় করে—মিষ্টি হাসি হেসে তার আঁধার মন রামধনুকের সাত রংয়ে রাঙিয়ে দাও। [প্রস্থানোদ্যত]

জয়ন্ত। }
শিকারিণী। } মঞ্জু!

মঞ্জরী। মঞ্জু যার মন রাঙাতে পারেনি, বেদের মেয়ে একাবতীকে এনে দিয়ে তার মন রংয়ের ছটায় ভরিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। মঞ্জরী—মঞ্জু! দাঁড়াও—শুনে যাও। অনেক অপরাধ তোমার ক্ষমা করেছি, এবার তোমাকে—[প্রস্থানোদ্যত]

শিকারিণী। দাঁড়াও ঠাকুরপো!

জয়ন্ত। [ফিরিয়া] তুমি--

শিকারিণী। এতক্ষণে সব বুঝতে পারলাম। নারীর স্বভাব-সুলভ কুসংস্কার মঞ্জুর মনে ধাঁধা সৃষ্টি করেছে। ও ভেবেছে—

জয়ন্ত। ও যা ভেবেছে, তুমি তার এক বিন্দুও ভাবতে পারনি বৌদি।

শিকারিণী। এ কথার অর্থ?

জয়ন্ত। অত্যন্ত গভীর। মঞ্জুর সন্দেহের বিষ পাথর যে গভীরে ডুবেছে, তোমার-আমার চিন্তার জাল তাকে নাগাল পাবে না।

শিকারিণী। ঠাকুরপো!

জয়ন্ত। এর চেয়ে বেশী কিছু আজ জানতে চেয়ো না বৌদি, বলতে পারবো না।

শিকারিণী। বলতে তোমাকে হবে না—আর শুনতেও আমি চাই না। গরীবের ঘরের মেয়ে—রাজবাড়ীর বৌ হয়েছি, দশ বছর হলো আমি স্বামীর সংসারে এসে তোমাদের আভিজাত্যে আঘাত করেছি।

জয়ন্ত। বৌদি!

শিকারিণী। স্বামীকে শুধু পূজোই করেছি—আজও তার মনের নাগাল পাইনি। তাতে আমার দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু—এ প্রাসাদের অনেকে আমাকে ভুল বোঝে।

জয়ন্ত। আমি—

শিকারিণী। তুমি আমার স্বামীর ভাই—এ আমি কোনদিন ভাবিনি—ভেবেছি আমারই ভাইয়ের মত। অনেক কথা—অনেক যুক্তি তুমি শুনেছ আমার—তোমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছি, তাই মঞ্জুকে তুমি বলে দিও ভাই! তার স্বামী রাজবাড়ীর সম্ভ্রম খুইয়ে,

রাজবংশের আভিজাত্য হারিয়ে—তার বৌদির আদর্শে পথ চলে—দেবতা না হয়ে মানুষ হয়েছে।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। বৌদি! বৌদি! চলে গেল। ভগবান! এমন স্বর্গের দেবীকে পাঠিয়েছো আমার বৌদি করে! ভাগ্যবান আমি—রামায়ণে পড়েছি সীতার স্নেহ-মমতার কাহিনী; কিন্তু এ যুগে বাল্মিকী যদি থাকতেন তাহলে দেখতেন—রাজকমার জয়ন্ত, লক্ষ্মণের চেয়েও—

সামন্তপালের প্রবেশ।

সামন্ত। ভাগ্যবান।

জয়ন্ত। দাদা!

সামন্ত। শোন জয়ন্ত, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

জয়ন্ত। বল।

সামন্ত। ক'দিন ধরে আমি তোকে খুঁজছি।

জয়ন্ত। কেন?

সামন্ত। কি ভেবেছিস তুই?

জয়ন্ত। বাজে কথা বাদ দিয়ে সোজা করে বল।

সামন্ত। বলবো কি করে? সোজা কথা তুই বুঝবি না। কারণ—

জয়ন্ত। কারণ?

সামন্ত। সোজা পথে না চলে আজকাল তুই বাঁকা পথে চলছিস।

জয়ন্ত। সোজা পথে বোধহয় কাঁটা ছিল?

সামন্ত। কাঁটা নয়। আমি আছি সোজা পথে, তাই বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে আমাকে পেছনে ফেলতে চাস।

জয়ন্ত। ব্যাপারটা সেই কচ্ছপ আর শশকের উপাখ্যানের মত।

সামন্ত। চুপ কর জয়ন্ত!

জয়ন্ত। বল কি বলবে।

সামন্ত। রাজ্যটা কার?

জয়ন্ত। কোন রাজ্যটা?

সামন্ত। মণ্ডলগাঁ।

জয়ন্ত। আমাদের।

সামন্ত। আমাদের মানে—

জয়ন্ত। মানে—তোমার, আমার, সমস্ত প্রজাদের।

সামন্ত। প্রজাদের কথা ছেড়ে দে। তোর—না আমার?

জয়ন্ত। তোমার আমার কারও নয়, পিতার।

সামন্ত। পিতা বৃদ্ধ—পঙ্গু।

জয়ন্ত। শালগ্রাম শিলার হাত-পা কিছুই নেই, তা বলে পূজো সে কম পায় না।

সামন্ত। ওসব বাজে কথা রাখ।

জয়ন্ত। কাজের কথা বল।

সামন্ত। রাজ্যটা কি তোর কথাতেই চলবে?

জয়ন্ত। তার মানে?

সামন্ত। মানে তালুকদারের সম্বন্ধী শুকুর খাঁকে অপমান করে, তাদের মসজিদকে তাচ্ছিল্য করে, এক বেদেনীকে—

জয়ন্ত। নিয়ে এসেছি। কিন্তু কাউকে অপমানও করিনি আর কোন মসজিদকে আমি তাচ্ছিল্যও করিনি।

সামন্ত। এ ঘটনা পিতা জানেন?

জয়ন্ত। জানেন।

সামন্ত। কই, আমি তো জানি না।

জয়ন্ত। তোমার জানবার দরকার ছিল না।

সামন্ত। জয়ন্ত!

জয়ন্ত। এতবড় রাজ্য, পিতা অসুস্থ। যুবরাজ তুমি, রাজকার্য্য—রাজনীতি বড় বড় সমস্যা, এই নিয়ে তোমার ব্যস্ত থাকার কথা। এসব সামান্য ঘটনার সংবাদ তুমি রাখতে যাবে কেন?

সামন্ত। কিন্তু কৈফিয়ৎ যে আমাকেই দিতে হবে।

জয়ন্ত। কিসের কৈফিয়ৎ? কাকে দিতে হবে?

সামন্ত। হাসান খাঁর সম্বন্ধী শুকুর খাঁ এসেছে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

জয়ন্ত। কোথায় সে মহাপুরুষ?

নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। সদর মহলে অপেক্ষা করছে।

জয়ন্ত। পিতা!

নরপাল। এ তুই কি করেছিস জয়ন্ত? সারা বাংলায় আজ মুসলমান প্রতিপত্তি—বাংলার নবাব মুসলমান। এ সময় কাজী হাসান খাঁকে অপমান করে তার প্রজাকে আমার রাজ্যে নিয়ে আসা উচিত হয়নি।

জয়ন্ত। তাহলে চোখের সামনে নারীর অপমান হচ্ছে দেখেও মুখ বুজে থাকা উচিত ছিল পিতা?

নরপাল। কি করবে বল। যুগধর্ম্ম পালটে গেছে। এ যুগে মাটির চেয়ে লাঠির জোর বেশী।

জয়ন্ত। আমি তা মানি না পিতা।

সামন্ত। তোর মানা না মানায় কি আসে যায়!

জয়ন্ত। তুমি কি বলছো দাদা?

শুকুর খাঁর প্রবেশ।

শুকুর। যুবরাজ ঠিক কথাই বলছেন।

জয়ন্ত। তুমি!

শুকুর। হ্যাঁ, আমি। তোমাদের সদর মহলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি। কত ব্যাটা বান্দাকে দিয়ে খবর দিলাম, তা কেউ আমার কথা কান দিয়ে শুনলো না। হতো আমাদের মহল, চাবকে পিঠের ছাল তুলে দিতাম।

জয়ন্ত। বাতচিৎ সামলে করবে খাঁ সাহেব। আমাদের কর্ম্মচারী-গুলো ভীষণ অসভ্য। খাঁ সাহেব দেখলেই তেড়ে আসে।

শুকুর। জয়ন্তপাল!

নরপাল। শুকুর খাঁ! মনে রেখো, এটা হাসান কাজীর তালুক নয়।

শুকুর। সে জানি রাজা। এখন এই এত্তেলার জবাবে কি করছেন করুন। [এত্তেলা সামন্তের হাতে দিল]

নরপাল। কি লিখেছে তালুকদার?

সামন্ত। লিখেছে—

জয়ন্ত। পত্রপাঠমাত্র বেদেনী একাবতীকে শুকুর খাঁর সঙ্গে আমার তালুকে পাঠিয়ে দেবেন।

নরপাল। তাই লিখেছে?

সামন্ত। হ্যাঁ পিতা।

জয়ন্ত। আরও লিখেছে—কুমার জয়ন্তপাল আমার মাননীয় সম্বন্ধীকে পয়জার মেরেছে।

শুকুর। না-না, মিথ্যা কথা তিনি লিখতে যাবেন কেন?

জয়ন্ত। এবং মসজিদকে ঘৃণা করে তার দুয়ারে থুথু ফেলেছে—তার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ চাই। তাই না?

সামন্ত। ঠিক তাই।

শুকুর। তাহলে দিয়ে দিন এত্তেলার জবাব।

জয়ন্ত। পিতা!

নরপাল। তুমি কি বলছো সামন্ত?

সামন্ত। আমি বলছিলাম—বেদেনীকে শুকুর খাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, আর জয়ন্ত নিজমুখে ক্ষমা চেয়ে নিক।

জয়ন্ত। পিতা!

নরপাল। সেই ভাল জয়ন্ত। কোথাকার এক বেদের মেয়ের জন্য রাজ্যে কেন ঝড় ডেকে আনবি? তালুকদার লোক ভাল নয়, এক্ষুনি হয়তো এই সামান্য ঘটনা পাঁচখানা করে নবাবের কানে তুলবে। তার চেয়ে—

শিকারিণীর পুনঃ প্রবেশ।

শিকারিণী। রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে বাস করুন। প্রজারা বুঝুক, মণ্ডলগাঁয়ের রাজা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন।

সামন্ত। শিকারিণী!

শিকারিণী। তোমরা কি পুরুষ, না নারী? কোথাকার তালুকদার হাসান খাঁ—তার ভয়ে সত্যকে অস্বীকার করে মিথ্যার আশ্রয় নেবে? দেহে কি চামড়া নেই—বুকে কি রক্ত নেই তোমাদের?

জয়ন্ত। বৌদি!

শিকারিণী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এই তোমাদের পৌরুষত্ব? পথের কুকুর এসে ল্যাজ নাড়বে, তোমরা তা হাসিমুখে সহ্য করবে? কেন, পারবে না তার মাথায় শিক্ষার মুগুর মারতে?

শুকুর। নারি!

নরপাল। থামো খাঁ সাহেব! এ নারীকে তুমি চেনো না। কিন্তু বৌমা—

শিকারিণী। কিসের কিন্তু বাবা? আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন বলে মণ্ডলগাঁয়ের সকল প্রজাই কি বৃদ্ধ? আপনার দুইদিকে দুই ছেলে, তারাও কি কর্ম্মশক্তি রহিত?

সামন্ত। শিকারিণী! রাজনীতির মধ্যে তোমার মাথা গলানোর অর্থ?

শিকারিণী। নারী বর্জ্জন করে রাজনীতি নয়।

সামন্ত। তা বলে বাইরের লোকের সামনে তুমি এইভাবে গলাবাজী করবে?

শিকারিণী। পুরুষ যেখানে মূক, নারী সেখানে মুখরা।

সামন্ত। শিকারিণী!

শিকারিণী। বাবা! বলে দিন তালুকদারের দূতকে, মণ্ডলগাঁয়ে মানুষ আছে। যে বেদেনীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাকে আর কোথাও পাঠানো হবে না। আর—

নরপাল। আর বলতে হবে না মা! এবার আমার জরাজীর্ণ দেহে হারিয়ে যাওয়া শক্তি ফিরে আসছে। একটু আগে যা ভাবছিলাম, এখন তার বিন্দুমাত্র বুকে নেই।

শুকুর। জলদি জলদি জবাব দিন রাজা, আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

জয়ন্ত। সময় আমাদেরও নেই মিঞা। বলগে তোমার ভগ্নি-পতিকে, বেদেনী একাবতীকে আশ্রয় দিয়েছে—

শিকারিণী। যুবরাণী শিকারিণী।

সামন্ত। তুমি—

শিকারিণী। নারী। নারী হয়ে নারীধর্ম্মের অবমাননা সইবো না। থাকো তোমরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, চিন্তা করুন মণ্ডল-গাঁয়ের রাজা। ফিরে যাক তালুকদারের দূত। যাবার সময় শুধু দেখে যাক তার প্রভুর পত্রের জবাব, মণ্ডলগাঁ—[এত্তেলা সামন্তের হাত হইতে লইয়া ছিঁড়িল] এমনি করেই দিয়েছে।

নরপাল।
জয়ন্ত।
সামন্ত। } ওকি!

শিকারিণী। ঠাকুরপো! পত্রের টুকরোগুলো আঁস্তাকুড়ে পুঁতে দিও কিংবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলো। নইলে মণ্ডলগাঁয়ের রাজবংশের অতীত পুরুষরা ঘৃণার থুৎকার দেবে, অযোগ্য অপদার্থ ভীরু কাপুরুষ বলে তোমাদের নামে মুখ ফেরাবে।

[প্রস্থান।

শুকুর। বেয়াদব নারী!

জয়ন্ত। সাবধান খাঁ সাহেব! আর একবার ওই কথা উচ্চারণ করলে, তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে কুকুরের মুখে ফেলে দেবো।

শুকুর। হুঁসিয়ার কাফের!

জয়ন্ত। আদেশ দিন পিতা, জানোয়ারটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিই।

নরপাল। না জয়ন্ত, থাক। হাজার হোক তালুকদার ওকে দূত হিসাবে পাঠিয়েছে।

শুকুর। না-না, খাতির করবেন কেন রাজা। যত খুশী অপমান করুন, যা ইচ্ছা বলে যান, আজ আমি কিছুই বলবো না।

সামন্ত। তুমি রাগ করো না খাঁ সাহেব।

শুকুর। চুপরও! পয়জার মেরে সোহাগ করতে এসো না। আমি তোমাদের মাফিক বাঙালী নয় যে, এক হাত পায়ে আর এক হাত গলায় দিয়ে দোস্তি করবো। আমি হাবসী, জবান আমার এক। মগজে আমার ঘি আছে। জবানে যা বলি, মগজে যা আসে—জান দিই, তবু তার কোনটাই বরবাদ করতে দিই না।

সামন্ত। চল খাঁ সাহেব, আমি—

নরপাল। দাঁড়াও সামন্ত।

সামন্ত। পিতা!

নরপাল। চুপ! লজ্জা হচ্ছে না, একজন বিদেশীর মুখে স্বজাতির নিন্দা শুনতে? ঘৃণা হচ্ছে না সামান্য একটা দূতের আস্ফালন সহ্য করতে? বৌমা মেয়েমানুষ হয়ে যে কথাগুলো বলে গেল, তার কি একটাও কানেও যায়নি তোমার?

সামন্ত। আপনি—

শুকুর। আরে দোস্ত! বাপ-ভাই-বিবির সঙ্গে একজোট হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

জয়ন্ত। শুকুর খাঁ!

শুকুর। ঘাবড়াও মাত জয়ন্তপাল। শুধু হাতে ফিরে আমি যাবো না। নিয়ে যাবো তালুকদারের এত্তেলার তিনটে টুকরো। গিয়ে দেখাবো কাজী হাসান খাঁকে, আর বলবো—রাজা নরপাল পঙ্গু, তার বড় ছেলে পুরুষ নয়, ছোট ছেলে শয়তান।

জয়ন্ত। হুঁসিয়ার বিধর্ম্মি!

শুকুর। আর তাদের সবার মাথায় পা দিয়ে চলে এক হুরী কি মাফিক ঔরৎ—নাম তার শিকারিণী।

জয়ন্ত। মর তবে জানোয়ার—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

শুকুর। [সরিয়া গিয়া] বহুৎ আচ্ছা জয়ন্তপাল! ইয়ে ইয়াদ রাখিয়ে—এ্যায়সা দিন নাহি রহেগা—[প্রস্থানোদ্যত]

জয়ন্ত। শুনে যাও জানোয়ার!

শুকুর। জানোয়ার সব শুনেছে দোস্ত। এবার তোমরা শুধু শুনে রাখো—আমার নাম শুকুর খাঁ, জাতে হাবসী, কলিজায় খুন, মগজে শয়তান—আর হাতে যে তিন টুকরো পত্র—এ অন্য কিছু নয়, তোমাদের তিন শয়তানের মউৎকা পরোয়ানা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

সামন্ত। কাজটা ভাল হলো না পিতা।

নরপাল। গর্ত্তে গিয়ে মাথা বাঁচাও।

জয়ন্ত। শয়তানের সাহস দেখলেন?

নরপাল। দেখলাম জয়ন্ত। শুকুর খাঁর সাহস যত না অবাক করেছে, তার শতগুণ অবাক করেছে তোমার জ্যেষ্ঠের কাপুরুষতায়।

সামন্ত। পিতা!

নরপাল। থামো মূর্খ। আমি না হয় বৃদ্ধ, তা বলে তোমারও কি বার্ধক্য এসেছে? যাও, আজ থেকে কোন রাজকার্য্য করবার আগে বৌমার সঙ্গে যুক্তি করবে।

জয়ন্ত। আমি কি করবো পিতা?

নরপাল। তুমি—

গীতকণ্ঠে কঙ্কালের প্রবেশ।

কঙ্কাল ।—

গীত।

সৈনিক, ধর হাতিয়ার।
কর্ম্মে অটুট হও, ধর্ম্মে অটল, অন্যায়ের কর প্রতিকার।
অন্তর ভরে থাক ফল্গুধারায়, মন্তরে জ্বালো বাতি,
যাহার বিমল শিখা অরুণের লালে লাল ঘুচাইবে দুঃখ রাতি।
হে জওয়ান নিভীক—গাও জয়গান স্বর্গের বড় দেশমাতৃকার।

নরপাল। কে তুমি ?

কঙ্কাল। আমি ? আমি ইতিহাসের কঙ্কাল।

নরপাল। ইতিহাসের কঙ্কাল !

কঙ্কাল। তুমি যে ইতিহাসের কথা ভাবছো, সে ইতিহাস আমি নই। আমি গুপ্ত ইতিহাস,—ইতিহাসের কঙ্কাল। আমার কথা কেউ লিখবে না—কেউ জানবে না—কেউ শুনবে না।

[প্রস্থান।

সামন্ত। লোকটা সাক্ষাৎ উন্মাদ !

নরপাল। যাও—যাও, নিজে আগে মানুষ হও, তার পরে অপরের বিচার করবে। তুমিও যাও জয়ন্ত, বড় বৌমার কাছে শুনে নাও এরপর কি করতে হবে। হ্যাঁ, আমার নাম করে বড় বৌমাকে বলবে—আজ থেকে রাজকার্য্যে তার স্থান আগে। কেউ তাকে কোন কাজে বাধা দিতে পারবে না, এমন কি আমিও না—আমিও না।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। যাও দাদা! যা করেছো—করেছো, এরপর ঠিক পথে চলো। বাবা বৃদ্ধ, হয়তো আর দু'বছর তিনি আমাদের সাহস দেবেন। তারপর এই বিশাল রাজ্যের সকল দায়িত্ব যে তোমাকেই বইতে হবে। সাহসে বুক বাঁধো, আজ থেকে মনে রেখো—দুর্ব্বল রাজার সিংহাসনে অধিকার নেই।

[প্রস্থান।

সামন্ত। সে আমি জানি মূর্খ, জানি বলেই এখন থেকে শক্ত হয়ে পথ চলছি। পিতা স্বেচ্ছায় আমাকে সিংহাসন দেবে না, অথচ সিংহাসন আমার চাই। তাতে সোজা পথে পাই উত্তম—না হলে—বাঁকা পথ তো খোলাই আছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তালুকদারের প্রাসাদ।

ফর্দ্দ হাতে হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। বাঁকাচাঁদ বিশ্বাস—একজন খাটিয়ে, কিন্তু খাইয়ে সাতজন। তারপর মেয়ের বিয়ে—মানে সাদী, একে একশো আসরফি দেওয়া যাক। সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী—বাতে পঙ্গু, স্ত্রীর—মানে বিবির অসুখ, একে দেওয়া যাক পঞ্চাশ আসরফি। এটা কে? ও, মইজুদ্দিন খাঁ। সাকিন—মেহেদীপুর—কি আর্জ্জি? ম-স-জি-দ সংস্কার। তুৎতোরীকা—মানুষ মরছে উপোস করে, সেদিকে নজর নেই, মসজিদের সংস্কার! আরে মিঞা মইজুদ্দিন! মসজিদ সংস্কার করবার আগে দীলগুলো সংস্কার করা চাই, না হলে মসজিদে মাথা ঠুকে কিচ্ছুটি হবে না। যাক মেহের—না মেহেদীপুরের মইজুদ্দিদ মোল্লার আর্জ্জি—

মনসার পুঁথি হাতে মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। না-মঞ্জুর। ওর নামটা ফর্দ্দ থেকে কেটে দাও চাচাজান।

হোসেন। আরে চুপ কর মামুদ, চুপ। তোর আম্মা শুনতে পেলে—

মামুদ। চিল্লে চিল উড়িয়ে তবে ছাড়বে।

হোসেন। আরে থাম—থাম। যাক, তোর হাতে ওটা কি রে মামুদ ?

মামুদ। কিতাব।

হোসেন। কিসের কিতাব ?

মামুদ। মনসার।

হোসেন। এঁ্যা ! মনসার ?

মামুদ। হঁ্যা চাচা, মা মনসার পুঁথি। ভারি সুন্দর করে লেখা। শুনবে দু' পাতা ? [সুর করিয়া পড়িতে লাগিল]

প্রথমে বন্দনা করি প্রভু নারায়ণে।
বন্দি শিব পঞ্চানন পুত্র গজাননে॥
দক্ষিণে বন্দিনু ব্রহ্মা বামে বন্দি শিব।
সম্মুখে বন্দিনু গৌরী বন্দি সর্ব্বজীব॥

হোসেন। তারপর ?

মামুদ। [পুনঃ পাঠ] একদিন লক্ষ্মীসহ পূর্ণব্রহ্ম হরি—

হোসেন। আচ্ছা মামুদ ! কিতাব তো পড়ছিস, মানে কিছু বুঝছিস ?

মামুদ। কেন বুঝবো না চাচা ! তবে সব কথাগুলো বুঝতে পারি না। সেদিন এই হরির মানে বুঝতে না পেরে আব্বার কাছে গেলাম জিজ্ঞাসা করতে।

হোসেন। তারপর ?

মামুদ। আব্বা তো রেগে লাল। ছুটে পালিয়ে গেলাম আম্মার কাছে। কথাটা শুনে আম্মা আবার এক চড় মারলে, মেরে বললে—

হোসেন। কি বললে ?

মামুদ। বললে—খবরদার, ওইসব কাফেরদের কিতাব পড়বি না। যদি দেখি পড়ছিস, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

হোসেন। তা বলবে। ইসলামের আসল ভক্ত কিনা!

মামুদ। কিন্তু দাদুসাহেব সেদিন সেই 'হরির মানে বলে দিয়েছিল।

হোসেন। বলেছিলেন! তাহলে তাঁর জাত গেছে মামুদ। হ্যাঁ, কি বললেন তিনি?

মামুদ। বললে—হরি মানে শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রীকৃষ্ণ মানে হিন্দুদের এক ধর্ম্ম-সংস্কারক অবতার। আমাদের যেমন হজরত মহম্মদ, হিন্দুদেরও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছো চাচাজান?

হোসেন। বুঝতে দেয় কই এরা? যখনই ভাবি রাম-রহিম এক জাত—সে জাত মানুষ; খোদা-ভগবান একই ঈশ্বরের পৃথক পৃথক নাম, তখনই মোল্লা-মৌলভী হাফেস সাহেবের দল চিৎকার করে বলে, হুঁসিয়ার ইসলাম ভাইসব! হিন্দুরা কাফের, তাদের মূর্ত্তি পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

মামুদ। তুমি এসব কথা বিশ্বাস কর চাচা?

হোসেন। না; কিন্তু ওরা বলে বিশ্বাস করতেই হবে।

মামুদ। না চাচা, তুমি কিছুতেই তাদের কথা বিশ্বাস করো না।

হোসেন। তাহলে যে দোজাকে যেতে হবে মামুদ।

মামুদ। তাই যেও চাচা। মানুষকে দুষমন ভেবে বেহেস্তে যাওয়ার চেয়ে ভাই মনে করে দোজাকে যাওয়াও আনন্দ আছে।

হোসেন। ওরে শিশু! ওরে সবুজ! কোথায় শিখলি এসব কথা? তোর কথা শুনে আমার ছাতিখানা ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে—কি মনে হচ্ছে জানিস? মনে হচ্ছে—আমরা যা পারিনি, তোরা তা পারবি। তোদের কালেই বুঝি হিন্দু-মুসলমান ভাইয়ের

মত পাশাপাশি বাস করবে। হিন্দুর মন্দির গড়তে মুসলমান দেবে চাঁদা, মুসলমানের মসজিদ ভাঙতে হিন্দুরাই দেবে বাধা। রাম-রহিম, হাসি-হাসিনা একসঙ্গে গাইবে—

মামুদ ।—

গীত।

শোন রে মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
স্বর্গ সে তো অনেক দূরে বেহেস্ত কোথা জানি না,
জল আর পানী নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদাভেদ আমরা কভু মানি না।
এসো হাত ধরে চলি, সব বাধা পায়ে দলি, জন্মভূমির জয় গাই।

গহরজানের প্রবেশ।

গহর। আবার গাও—আবার গাও দাদুভাই! তোমার ওই গানের সুর আসমানে ছড়িয়ে যাক, জমিনে জড়িয়ে যাক। চিড়িয়ার দল ওই গানের ভাষা শুনিয়ে দিয়ে আসুক দুনিয়ার ঘরে ঘরে।

শোভানাবানুর প্রবেশ।

শোভানা। না মামুদ! খবরদার ও গান গাইবি না।

গহর। কেন গাইবে না শোভানা?

শোভানা। ও গান শুনলে—

হোসেন। ইমানদার মুসলমানরা দোজাকে চলে যায়।

শোভানা। তামাসা করছো ছোট সাহেব!

হোসেন। তওবা—তওবা। ভাবী! ধর্ম্ম নিয়ে তামাসা করতে পারি? দুনিয়ার সেরা ধর্ম্ম ইসলাম, সেই ধর্ম্মের ভক্ত তুমি—সেই

তোমার সঙ্গে তামাসা? তাহলে যে আমাকে দোজাকে যেতে হবে ভাবী!

শোভানা। দোজাকেও তোমার ঠাঁই হবে না।

মামুদ। সেইজন্যই তো বেহেস্তে যাবে।

শোভানা। চুপ কর হতভাগা ছেলে। তোর হাতে ওটা কি?

মামুদ। [চাচার কাছে সরিয়া গিয়া] কিছু নয়।

শোভানা। কিছু নয়! আম্মার সঙ্গে তামাসা? [পুঁথি কাড়িয়া লইয়া দেখিয়া] তওবা—তওবা! এ যে কাফের হিন্দুদের মনসা ঠাকুরের পুঁথি। ভাগাড়ে যাক কাফেরদের পুঁথি। [পুঁথি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

গহর। [পুঁথি কুড়াইয়া] কি খেয়ে মানুষ হয়েছিস শোভানা! ভাত, রুটি—না ছাই?

শোভানা। বাপজান!

গহর। এমন মেজাজ তোর? এমন দিল কালো? তোদের তালুকে কত হিন্দুকে দেখেছি সত্যপীরের গান শুনতে, কত হিন্দু মেয়ের চোখে কারবালার কাহিনী শুনে পানী ঝরতে দেখছি, কই— তারা তো তোর মত নয়? মুসলমানদের পুঁথি—কই, তারা এমনি করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় না?

হোসেন। তাদের কথা বাদ দিন, তারা আলাদা জাত।

শোভানা। তারা কাফের।

মামুদ। কাফের তুমি।

[প্রস্থান।

শোভানা। বাপজান! মামুদকে তুমি এইসব শেখাও?

গহর। কি সব রে শোভানা?

শোভানা। হরি-নারায়ণ-গৌরাঙ্গ—এরা অবতার, সীতা-সাবিত্রী-সতী—এরা সালামের পাত্রী?

হোসেন। না ভাবী। উনি এসব কিছুই শেখাননি, মামুদ আপনি শিখেছে।

শোভানা। আপনি শিখেছে! তুমি আমাকে পাগল ভেবেছো ছোট সাহেব?

হোসেন। মাথা খারাপ!

শোভানা। তবে কে শেখালো এসব?

হোসেন। বাংলার পবিত্র মাটিতে পরম পবিত্র কাহিনী ছড়ানো। এদেশের পাখীরাও এ কাহিনী গেয়ে বেড়ায়। মানুষ তো ছার, হিংস্র জানোয়ার পর্য্যন্ত এ কাহিনী শুনলে হিংসা ভুলে যায়।

শোভানা। বুঝেছি, এসব তোমারই চালবাজী!

গহর। চালবাজী নয় রে হতভাগী, ভোজবাজী! জন্মেছিস আফ্রিকার জঙ্গলে, বাংলার কাহিনী জানবি কি করে? বেহেস্ত-মাফিক দেশ এই বাংলায় মুসলমান ছিল না। কতকগুলো মুসলমান আরবের মরুভূমির জ্বালা সইতে না পেরে এসেছিল এখানে। তারাই জোর করে—গোয়ার্ত্তুমী করে—বেইমানী করে এ দেশের হাজার হাজার হিন্দুকে মুসলমান বানিয়েছে।

শোভানা। চুপ কর তুমি।

গহর। কেন চুপ করবো, তোর ভয়ে? তুই আজ তালুকদারের বেগম হয়েছিস বটে!

হোসেন। আপনি—

গহর। তোমার ভাবীকে জিজ্ঞাসা কর তো বাপজান, তার খসমের বাপের নাম কি? কোন মুলুকে ছিল তার বাড়ী!

শোভানা। তুমি—

গহর। হিসাব করে দেখেছি—যাকে তুই হরিনাম করতে মানা করিস, যার হাত থেকে মনসার কিতাব কেড়ে নিয়ে ধুলোয় ফেলে দিস, সে কখনও ওসব ভুলতে পারে না—রক্তে বইছে যার হিন্দুর সংস্কার, তাকে জোর করে মুসলমান করা যায় না।

শোভানা। তার অর্থ?

গহর। অর্থ? মামুদের বাপের দাদু ছিল হিন্দু—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, হাবসী নবাব সিদ্দিবদর তাকে জোর করে মুসলমান করেছিল—

হোসেন। কি বলছেন আপনি।

গহর। ঠিক—ঠিক বলছি ব্যাটা, একবিন্দু বেঠিক নয়। যে বাঙালী মুসলমানগুলোকে দেখছো—এদের পূর্ব পুরুষরা অনেকেই হিন্দু ছিল।

শোভানা। এসব মিথ্যা কথা।

গহর। তাহলে তুই যে আমার বেটি এ কথাও মিথ্যে।

শোভানা। বাপজান!

গহর। চুপ কর বে-সরম! হাত শুঁকে দেখ, এখনও গোবরের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরুচ্ছে। আয়নায় জিভ দেখলে দেখতে পাবি এখনও লেগে আছে হিন্দুর দেওয়া ভাতের দানা। মা-বেটিতে গোবর কুড়োতিস—আমি করতাম বামুনবাড়ী রাখালী—এক থালা ভাত চারজনে খেতাম ভাগ করে। সেসব দিনের কথা বেমালুম হজম করে ফেলেছিস? এতবড় বে-ইমান। যে জাত নিমক খাইয়ে মানুষ করলে, সে জাতের সঙ্গেই নিমকহারামী?

শোভানা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। আমার মান-ইজ্জত সব ভাগাড়ে লুটিয়ে দিলে। তালুকদারের বেগম বচপনে গোবর কুড়িয়েছে শুনলে লোকে হাসবে।

হোসেন। ভয় কি ভাবী, কেউ তো শোনেনি!

শোভানা। শুনতে আর বাকী আছে?

হোসেন। শুনেছে তো কি হয়েছে? এত সাহস তাদের যে, বিশজন লোকের মজলিসে বলবে বেগম সাহেবা মাঠে মাঠে গোবর কুড়োয়! বলুক দেখি—পাঠিয়ে দেবো শালা সাহেব শুকুর খাঁকে, মস্ত চাবুক নিয়ে শূকরের মত তেড়ে যাবে না?

শোভানা। তওবা—তওবা! কি লজ্জা! আমার বাবা গরু চরাতো!

গহর। এখনও হাতে পাচনের দাগ আছে।

শোভানা। থামো তুমি বে-সরম! সরম বলতে নেই, ইজ্জত বলতেও নেই?

গহর। দূর বেটি, রাখালের আবার সরম ইজ্জত—

শোভানা। ওঃ, কি কাণ্ড! আমি কি করি—কার মাথা চিবিয়ে খাই? এই কে আছিস—

হাসান খাঁর প্রবেশ।

হাসান। আমি ছাড়া আর কেউ নেই শোভানা বেগম!

শোভানা। তুমি জানো আমি ছেলেবেলায় আম্মার সঙ্গে মাঠে মাঠে গোবর কুড়োতাম?

হাসান। জানি।

শোভানা। ও—তাই আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসো, তাই আমার অসাক্ষাতে এনকারের চোখে চাও, তাই তো আমার চেয়ে ভাই তোমার আপন বেশী—

হাসান। হলো কি শোভানা?

শোভানা। আগুন লেগেছে আমার মগজে। চল বাপজান, আবার আমরা গোবর কুড়োবো, তুমি রাখালি করবে। আম্মাজান নেই—থাকলে কোন হিন্দুর বাড়ী বাঁদীগিরি করতো। তওবা—তওবা! করেছো কি বাপজান ? এর চেয়ে যদি আমাকে কোন রাখালের হাতে তুলে দিতে—

হাসান। বেগম সাহেবা!

শোভানা। চুপ কর কাজী সাহেব! কিসের তুমি তালুকদার ? তোমার তালুকে এক কাফের বামুন, মুসলমানের মুখে তাদের রসুই করা ভাত তুলে দেয়—আর তুমি তাই সহ্য কর ?

হাসান। সে তো অনেকদিন আগের ঘটনা বেগম, আজ তারা কেউ বেঁচে নেই।

শোভানা। তারা না থাক, হিন্দুরা তো আছে। এখনও তোমার তালুকে তারা ঠাকুরপূজো করছে, সাঁঝবেলায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করছে—

হাসান। তা করছে।

শোভানা। না, তারা তা পারবে না করতে। তুমি ফতোয়া জারী করে দাও—কাল থেকে ঠাকুরপূজো বন্ধ।

হোসেন। ভাবি!

শোভানা। পুতুল আর পাথরপূজো চলবে না।

গহর। শোভানা!

শোভানা। পথে-ঘাটে একটা চাষী মুসলমান দেখলে পণ্ডিত হিন্দুকে তসলিম জানাতে হবে।

হোসেন। না ভাবী, তা তারা দেবে না।

হাসান। আলবৎ দেবে। না দিলে তাদের কোতল করা হবে।

হোসেন। তাহলে বাংলার মাটিতে আর ইসলামের ই-কার পর্য্যন্ত থাকবে না।

শোভানা। কি হবে?

হোসেন। ধ্বংসের দরিয়ায় ভেসে যাবে।

হাসান। তার অর্থ?

হোসেন। জানো না ভাইজান, এই ভারতেরই ঘটনা। বিশাল কৌরবকুল কেন হয়েছে নির্ম্মূল, লঙ্কার রাজা রাবণ কেন হলো সবংশে নিধন—

শোভানা। তওবা—তওবা! কাফের হিন্দুদের কাহিনী মুসলমানের মুখে?

হোসেন। শুধু হিন্দুদের কাহিনী নয় বেগম সাহেবা, কারবালার কাহিনী স্মরণ করো।

হাসান। তাহলে কি বলতে চাও তুমি?

হোসেন। বলতে চাই—হিন্দুরা পূজা করবে, মুসলমানেরা নমাজ পড়বে—

গহর। পূজা, মন্ত্র আর নমাজের আজান একসঙ্গে মিশে দুনিয়ার মালিকের দরবারে পৌঁছে দেবে এক নয়া বেহেস্তী পয়গম।

হোসেন। সেই পয়গম শুনে দুনিয়ার মালিক খোদা নেমে আসবেন বাংলার বেহেস্তে এই মাটির বুকে।

হাসান। চুপ কর হোসেন। এতদিনে বুঝলাম, তুমিও কাফের।

হোসেন। বুঝতে তোমার দেরী হয়ে গেছে ভাইজান।

শোভানা। জানো কাজী সাহেব, আমি নিজের চোখে দেখেছি ছোট সাহেব চণ্ডী, গীতা, পুরাণ, উপনিষদ পাঠ করে—

গহর। আমাকে শোনায়।

শোভানা। কখনও মসজিদে যায় না, নমাজ পড়ে না, কোরানের পাতা ভুলেও ওল্‌টায় না।

হোসেন। সময় পাই না ভাবী সাহেবা। চণ্ডী-গীতার মধুর বাণী, পুরাণের বেহেস্তী উপদেশ আমাকে কোরানের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। তাছাড়া আমার কোরান আলাদা, আমার বেহেস্ত দূরে নয়, এই মাটির দুনিয়ায়। যখন দেখি চোখের সামনে কঙ্কালসার মানুষগুলো খাদ্যাভাবে কাঁদছে—যখন দেখি বাংলার মেয়েরা বে-ইজ্জত হচ্ছে, তখন ভুলে যাই আমি কোরান শরীফের কথা, পানীতে ভরে যায় পুরাণের পৃষ্ঠা। শুধু মনে মনে ভাবি, এস তুমি দুনিয়ার দুঃখহরণ, মধুক্ষরা কণ্ঠে শোনাও তোমার বরাভয় বাণী—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥"

হাসান। }
গহর। } হোসেন!

হোসেন। [আপন ভাবেই বলিতেছিল]—

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্‌ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

[প্রস্থান।

হাসান। ভাই বলে খাতির করি—তাই হোসেন ভেবেছে, হাসান খাঁ দুর্ব্বল। না-না, দুর্ব্বল আমি নই। কারও বেয়াদবী আমি বরদাস্ত করবো না। ফিরে আসুক মণ্ডলগাঁ থেকে শুকুর খাঁ—তারপর শুরু হবে কাজী হাসান খাঁর অত্যাচার।

শোভানা। ও! ভাবতে সরমে মরে যাই, এতবড় লোকের ভাই হয়ে নমাজকে করে এনকার।

হাসান। বেয়াদব হোসেন আলি খাঁ।

গহর। তার চেয়ে বে-আদব আমার বেটি।

শোভানা। কি বললে বাপজান!

গহর। বে-আদব, বে-শরম, বে-ইমান তুই। নইলে ভাইজানের কলিজা থেকে তার ভাইকে কেড়ে নিতে চাস? বাবাজী! এই শোভানা আমার বেটি—আমার চেয়ে ভাল ওকে কেউ তোমরা চেনো না। ও জেনানা নয়, শয়তানী।

শোভানা। চোপরাও কমবক্ত!

গহর। কি, আমি কমবক্ত! দেবো তোর গলা টিপে শেষ করে। যে মুখে তুই এমন বাখান করলি, সেই মুখ থেকে জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে।

হাসান। সরে যান এখান থেকে, নইলে ভুলে যাবো আপনি আমার বেগমের আব্বাজান।

গহর। তোমার বেগম যখন ভুলে গেছে, তখন তোমার ভুলতে দোষ কি? ওঃ—বেগম! ঘুঁটে-কুড়ুনীর বেটি বেগম হয়েছে!

শুকুর খাঁর প্রবেশ।

শুকুর। হুঁসিয়ার বাপজান! আমার জান্নতবাসিনী আম্মাজানের বে-ইজ্জত করলে, বাপজান বলে খাতির করবো না।

গহর। তা করবি কেন বে-তমিজ? আসমান থেকে পড়েছিস যে—মাটি ফুঁড়ে পয়দা হয়েছে তোদের। বলি রাজা নরপাল জুটিয়ে দিয়েছে বুঝি?

শুকুর। চোপরাও বে-আদব!

গহর। হুঁসিয়ার হারামজাদা! মাথা নিয়ে খুব পালিয়ে এসেছিস। যদি থাকে জানের মায়া, ভুলেও মগুলগাঁ আর যাসনি। তারা মূর্খ বলে এখনও তোর পিঠের চামড়ায় দাগ ফোটেনি। আমি যদি হিন্দু হতাম, তাহলে যে বে-আদবী তুই করেছিস, তার একমাত্র শাস্তি তোকে আমি দিতাম মুণ্ডুটা কেটে দরবারে ঝুলিয়ে রেখে।

শোভানা। বৃদ্ধ!

গহর। ওরে পোড়ারমুখী! বৃদ্ধ হয়েই আমি জন্মাইনি, তোদের মাফিক নওজোয়ান আমিও একদিন ছিলাম। এখনও বলছি সমঝে চলিস। তামাম কাজীবংশের একটিমাত্র চেরাগ সেই হোসেন—ভাই বলতে পাগল, ভাইজান না হাসলে সেও হাসতে ভুলে যায়। তোর বাচ্ছা তারই বুকে শুয়ে আরামে ঘুমোয়! আমি তোর বাপজান। নিজে না খেয়ে তোকে বড় করেছি, তোর কাছে জোড়-হাত করে বলছি—দোহাই বেটি, দোহাই আম্মা, দোহাই বেগম সাহেবা, হোসেনকে তুই তার বড় ভাইয়ের কলিজা থেকে কেড়ে নিস না।

[প্রস্থান।

শোভানা। দেখলে তোমরা—কেমন বে-আদবী করে গেল?

হাসান। গরু চরিয়ে চরিয়ে সব আদব ভুলে গেছে শোভানা।

শোভানা। তার মানে আমি বচপনে গোবর কুড়িয়েছি?

হাসান। যাক, সেকথা ছেড়ে দাও। শুকুর খাঁ! বল, আমার এত্তেলার জবাবে কি দিয়েছে রাজা নরপাল?

শুকুর। তসলিম।

হাসান। তসলিম!

শোভানা। দেবে না! হাজার হোক, কাফের হিন্দুগুলোর বুদ্ধি আছে।

শুকুর। শুধু বুদ্ধি নয় বহিন, সাহস আছে।

হাসান। তার অর্থ?

শুকুর। অর্থ—[এত্তেলার ছিন্ন তিনটি টুকরা দেখাইল] এক—দুই—তিন।

হাসান। কি ওগুলো?

শুকুর। তোমার এত্তেলার অংশ।

হাসান। শুকুর খাঁ!

শুকুর। আমাকে মেজাজ দেখিয়ে কি হবে ভাই সাহেব!

হাসান। এতবড় সাহস কাফের নরপালের—তালুকদারের এত্তেলা ছিঁড়ে আবার ফিরিয়ে দেয়!

শুকুর। পুড়িয়ে দিচ্ছিল, লুকিয়ে তিন টুকরো কুড়িয়ে এনেছি।

শোভানা। কেন, তাদের মাথাগুলো কেটে আনতে পারলে না?

শুকুর। আনবো বলে এসেছি—শুধু মাথাই নয়, নিয়ে আসবো যুবরাজের চুলের মুঠি ধরে।

শোভানা। সে কি করলে ভাইজান!

শুকুর। রাজা যুবরাজ সন্ধি করতে চাইলে, কিন্তু বাধা দিলে সেই কসবী।

শোভানা। কাজী সাহেব!

হাসান। বিরক্ত করো না শোভানা।

শুকুর। আমি—

হাসান। শুধু বলে যাও তারা কি কি বলেছে।

শুকুর। বলেছে—বেদেনীকে তো ফিরিয়ে দেবোই না, বরং তালুকদার হিন্দুদের উপর কেন অত্যাচার করছে তার কৈফিয়ৎ শীঘ্রই চাই।

শোভানা। আর—

শুকুর। আর হাসান খাঁ যেমন মন্দির ভাঙতে হুকুম দিয়েছে, আমিও তেমনি মসজিদ ভাঙতে হুকুম দেবো।

হাসান। কৈ হ্যায়—

শুকুর। কেন ভাই সাহেব?

হাসান। গোলন্দাজ হাফিজ খাঁকে তলব দাও—যে মন্দির ভাঙা হয়নি, কাল থেকে তা ভাঙতে হবে। মৌলভী সাহেব বাহারুদ্দিনকে বলো অবিলম্বে মাইফিল বসিয়ে জেহাদ ঘোষণা করুক।

শোভানা। তাতে নরপালের কি শাস্তি হবে কাজী সাহেব?

হাসান। হিন্দু কাফের রাজা নরপাল, তাকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো, কুমার জয়ন্তকে দেবো জীবন্ত কবর, আর খুবসুরৎ ঔরৎ যুবরাণীকে পুড়িয়ে—না-না, হলো না। চুলের মুঠি ধরে—না-না, তাও হলো না। হ্যাঁ-হ্যাঁ, হয়েছে—পেয়েছি। সেই শয়তানীকে কলমা পড়িয়ে মুসলমানী করে চুলের মুঠি ধরে জানোয়ারের সামিল হাবসী সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

শোভানা। শুনলে ভাইজান, হাবসীরা হলো জানোয়ারের সামিল।

শুকুর। তাইতো বলে গেল তোর খসম।

শোভানা। তুমিও তো সহ্য করলে! বলতে পারলে না হাবসীরা জানোয়ারের সামিল নয়, জানোয়ারের সামিল বাঙালীরা?

শুকুর। বলতে হবে কেন, সময় হলেই বুঝবে।

শোভানা। কবে বুঝবো শুনি? কতদিনে হিন্দুদের ঠাকুরঘর ভাঙা হবে? কবে বন্ধ হবে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ—কতদিন পরে শায়েস্তা হবে ছোট কাজী হোসেন খাঁ?

শুকুর। বাপজানকে শায়েস্তা করবার ভার আমার, তুই শুধু হোসেনকে দেখ শোভানা!

শোভানা। আচ্ছা, তাহলে শুনে রাখো ভাইজান, আজ থেকে শুরু হলো আমার নতুন করে অভিনয়—বড় সাহেবের দীল থেকে সব খোয়াব আমি চুষে নেবো, তার কলিজায় ঢেলে দেবো বিভেদের জহর। হোসেন খাঁকে দেখলেই জ্বলে উঠবে—আমি বলবো, করছো কি! হাজার হোক ভাই; সে বলবে না, ভাই নয়, ও কাফের, ও শয়তান—ও আমার এই জাহানে সবসে জিয়াদা দুশমন।

[প্রস্থান।

শুকুর। দুশমন! দুশমনকা শির নিয়ে আমি খেলবো খেল। তার তাজা খুনে মউজসে করবো গোছল। তারপর একহাতে থাকবে সিরাজীর পেয়ালা, আর এক হাতে থাকবে বশরাই গোলাব; দীলে থাকবে খুসি, মুখে ফুটবে হাসি—সেই হাসির বিজলী ছটায় দু'চোখের ইসারায়—ঝনক ঝনক পায়েল উঠবে বেজে। চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে সরমের সবুজ ওড়না খুলে যার চৌধবী-কি চাঁদ মাফিক মুখখানা দেখবো—সে মুখ আর কারও নয়, একাবতীর, আমার দীলকা না-গি-নীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঈশাণের বাড়ী।

ঝাঁপি মাথায় ডম্বরু বাজিয়ে ছদ্মবেশী একাবতীর প্রবেশ।

একাবতী। নাগিনীর আজ গোঁসা হয়েছে গো, কালনাগিনীর গোঁসা হয়েছে। দু' মাহিনাভর ওর বিষদাঁতে যত বিষ জমিয়েছিল, আমি আজ সেটা গেলে নিয়েছে। তাই গোঁসা করে নাগিনী আজ খাবে না—নাচ করবে না—খেল দেখাবে না। [ঝাঁপি নামাইয়া তাহার ঢাকা খুলিয়া নাগিনীকে বলিল] আরে এ কালনাগিনী! এখন যদি তোর ঝাঁপিতে কালনাগটিকে ছেড়ে দি, তাহলে তোর দাঁলে রং লাগবে না? তোর শরীলে সাড়া জাগবে না? [হাসিয়া] এই—এই বাত শুনে খুসি হয়েছে। লে, এবার জাগান দে। শোন, অমি এখন কাহিনী গাইবে—[বেদেনীর কায়দায় কখনও উঠিয়া, কখনও বসিয়া মনোহর ভঙ্গিতে কাহিনী গাহিতে লাগিল]

গীত।

হলদি কাপড় মোমের বাতি জ্বলছে সারা রাতি রে।
একা কন্যা জাগে সারা রাতি রে।
নাগর কথা কয় না,
মুখটি ফিরে চায় না,
দুরু দুরু কাঁপে কন্যার ছাতি রে, একা কন্যা জাগে সারা রাতি রে।
মা মনসার দোয়াতে,
শিব দেবতার দোয়াতে,
বেহুলা বাঁচাল মরা পতিরে, একা কন্যা জাগে সারা রাতি রে।

নীরবে রাণার প্রবেশ। কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিল এবং তাহার গান শুনিয়া বলিল।

রাণা। একা।

একাবতী। কে? রাণা! বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বে-সরম।

রাণা। বেরিয়ে যাবো?

একাবতী। আলবৎ যাব—যা বলছি—

রাণা। বেশ, তাই যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

একাবতী। কোথায় যাচ্ছিস?

রাণা। বেরিয়ে।

একাবতী। [হাতছানি দিয়া] শোন।

রাণা। না, আমি চলে যাচ্ছি।

একাবতী। এখন চলে গিয়ে কি ফয়দা হবে রে ছোকরা। সব তো দেখে নিয়েছিস।

রাণা। কি দেখেছি একা?

একাবতী। আমার নাচ, গান, আর যা দেখেছিস বলতে আমার সরম লেগেছে।

রাণা। একা!

একাবতী। হ্যাঁ রে ছোকরা, আমি ঝুট বাত বলে নাই। এখন সাঁঝের বেলা, কোন দোসরা লোক ঘরে নাই—আমি ছোকরী নাচ করছে, তুই ছোকরা এখানে আসলি কি বলে?

রাণা। তাতে হয়েছে কি?

একাবতী। আমার ইজ্জত গেছে রে জওয়ান। নাচ করছে—

কাহিনী করছে, এ সময় আমার কাপড় বে-ঠিক হয়ে গেছে—তুই আসলি তো জানান দিয়ে আসলি না কেনে?

রাণা। আমার ভুল হয়েছে একা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। [জোড়হাত করিল]

একাবতী। আরে জোড়হাত কেনে? জানে লেগেছে বুঝি?

রাণা। হ্যাঁ।

একাবতী। এই রাণা! তুই আমার বাত শুনে গোঁসা করলি?

রাণা। কাজটা তো আমার সত্যি অন্যায় হয়েছে। না—না, আমি চলে যাচ্ছি, আমি আগে এটা—

একাবতী। জানতিস না, কেমন? শিখে লে জওয়ান—শিখে লে, আখেরে কাজে লাগবে।

রাণা। কাজে লাগবে!

একাবতী। কেনে না লাগবে? যবে তোর বহু আসবে—তোর ঘর করবে, তবে কাজে লাগবে।

রাণা। একা!

একাবতী। এই বাত শুনে তোর মুখটা রাঙ্গা হয়ে গেল বটে! কেনে না হবে—বয়েসটা যে সেই মাফিক রে—বুঝলি?

রাণা। বুঝলাম।

একাবতী। ছাই বুঝলি।

রাণা। ছাই বুঝলাম!

একাবতী। কেনে না বুঝবি, সব তুই বোঝে, লেকিন—কাম করে যেন কিছু বোঝে নাই।

রাণা। বা বাবা! বেশ মেয়ে তো! থামতে চায় না—ব্যাপার ভালো নয়। দাদুর কথাই ঠিক—দেবে কোন দিন এক ছোবলে

সাবাড় করে। তার থেকে সরে যাওয়াই ভাল। তুমি যা করছিলে কর, আমি চলে যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

একাবতী। আরে এই রাণা—

রাণা। [ফিরিয়া] কি হলো, পিছু ডাকছো কেন?

একাবতী। অষুধ দিয়ে যা—

রাণা। ওষুধ। কিসের ওষুধ?

একাবতী। তোর দীলে নেশা লেগেছে—তার অষুধ।

রাণা। যা বাবা, কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

একাবতী। লেকিন আমি সব বুঝতে পেরেছে—আমি দেখেছে—আমাকে দেখে তোর বুক কেঁপে ওঠে, নজোর লাল হয়, মুখে মিঠা গানের সুর লাগে—

রাণা। না-না-না, ভুল—ভুল, আমার ওসব কিছু হয় না। [প্রস্থানোদ্যত]

একাবতী। [তীব্র গতিতে রাণার একটা হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া তীর্যক হানিয়া বলিল] ঝুট বাত বলিস না ছোকরা! আমার নজোরে নজোর দিয়ে বল আমাকে তোর ভাল লেগেছে না?

রাণা। একা!

একাবতী। লুকোস না জওয়ান। আমি বেদের মেয়ে—কালনাগিনী শিরে তোলে, ডোমনা দিয়ে বুকে জড়ায়, কালকেউটের চুমা খায়—আমার নজোরে কিছু ফাঁকি পড়ে না।

রাণা। আমি—

একাবতী। ফিরে যা ছোকরা। এখন আমার কাছে আসবি না, কখন আসবি জানিস?

রাণা। কখন ?

একাবতী। যখন আমার বুকে নাগচম্পার খসবু ছুটবে—তখন।

রাণা। একা !

একাবতী। হ্যাঁ রে রাণা, এই বাত ঝুট বাত নয়; যা বললম তাই হবে। এ আমার মিঠা রাতের নিশানা।

সামন্তপালের প্রবেশ।

সামন্ত। বাঃ—চমৎকার।

রাণা।
একাবতী। } কে ! [একাবতী রাণার হাত ছাড়িয়া দিল]

সামন্ত। আমি—সাক্ষী।

রাণা। যুবরাজ !

সামন্ত। বড় অসময়ে এসে পড়েছি রাণা—এমন জানলে আমি আসতাম না।

রাণা। না-না, তাতে কি হয়েছে যুবরাজ। আপনি যা ভাবছেন—

সামন্ত। তা নয়, কেমন ?

রাণা। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি—

সামন্ত। যুবরাজ হয়ে তোমার বাড়ী এই সন্ধ্যার অন্ধকারে কেন এলাম ? উপায় ছিল না রাণা—বাধ্য হয়েই এখানে আসতে হয়েছে।

রাণা। কেন যুবরাজ ?

সামন্ত। দেখতে।

রাণা। কাকে দেখতে যুবরাজ ?

সামন্ত। যার মোহে পড়ে আমার ভাই তোমার সঙ্গে মিতালী

করেছে, যার জন্য তালুকদার হাসান খাঁ বিষ দৃষ্টিতে মণ্ডলগাঁয়ের দিকে চেয়ে আছে, যার আবেশমাখা হাত একটু আগে তোমার হাতে লেগেছিল।

রাণা। যুবরাজ।

সামন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—রাণা! দেখতে এসেছি সেই নাগিনী কন্যাকে!

একাবতী। [খিল খিল করিয়া হাসিয়া] আমাকে তোর দেখা হয়ে গেছে? নিয়েছিস তো ভাল করে দেখে? [সামন্তের সামনে অগ্রসর হইল]

রাণা। একা!

একাবতী। হ্যাঁ রে রাণা! ওই লোক যেমন আমাকে দেখে নিয়েছে—আমিও তেমন ওকে দেখে নিয়েছি।

সামন্ত। কি দেখলি?

একাবতী। তোর চোখে জানোয়ারের তসবীর।

সামন্ত। বেদেনী!

একাবতী। কেন তুই চেল্লাচ্ছিস—তোকে আমি দেখেই বুঝেছি তুই শয়তান।

সামন্ত। সাবধান শয়তানী, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেবো।

একাবতী। তাই বুঝি মশয়—তবে নে, ধর তোর চাবুক, মার আমার পিঠে—তারপর দেখি তুই কেমন জওয়ান, আর আমি কেমন জওয়ানী—

সামন্ত। তবে রে হারামজাদী! [চাবুক উত্তোলন]

রাণা। [বাধা দিয়া] যুবরাজ!

সামন্ত। রাণা!

রাণা। আপনি ফিরে যান যুবরাজ। বেদেনী আমাদের আশ্রিতা, ওকে চাবুক মারলে ওর মান যাবে না—যাবে আমাদের।

সামন্ত। গেল গেলই—ছোটলোক জেলের আবার মান!

রাণা। আপনার মত ভদ্রলোকের চেয়ে এই ছোটলোকের মান ঢের বেশী।

সামন্ত। তবে রে শূয়ার—[চাবুক মারিতে উদ্যত]

রাণা। হুঁসিয়ার রাজকুমার—[চাবুক ধরিল]

সামন্ত। কি, এত সাহস! আমার চাবুকে হাত—

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। ওরে ও রাণা, করেছিস কি হতভাগা, রাজপুত্তুরের চাবুকে হাত দিয়েছিস কি, সুড় সুড় করে পিঠ পেতে দে, দয়া করে মাথাটা বাড়িয়ে দে—নইলে ভদ্দরলোকের জাত যাবে যে!

রাণা। দাদু! [চাবুক ছাড়িয়া দিল]

ঈশান। আরে হস্তিমূর্খ, ওদের চাবুক আর লাথি খাবার জন্তই তো আমাদের জন্ম—ওরা দেবতার জাত, চিরকাল আমাদের মাথায় পা দিয়ে রাজ্যি করছে, তা জানিস?

সামন্ত। ঈশান! ভাল চাস তো তোর নাতিকে সাবধান করে দিস, আর এখনি ওই ছুঁড়িটাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দে।

ঈশান। শকুনের তাহলে চোখ পড়েছে—

একাবতী। কেনে না পড়বে দাদাজী! ওই বে-আদব সেই শালা সাহেবের জাত, ওদের নজোরে বিষের আগুন! আমি বুঝে নিয়েছে—বেকুবটা সেই শালা সাহেবের দোস্ত বটে!

সামন্ত। চোপরাও হারামজাদী—

একাবতী। তুই হুঁসিয়ার—

ঈশান। এই চুপ—চুপ, চুপ কর ছুঁড়ি! ও রাজপুত্তুর। নিজের মান নিজে রেখে ভালয় ভালয় বাড়ী যাও—নইলে বেদের মেয়ে সাপ নিয়ে খেলা করে—যেমন দরাজ বুক তেমনি আলগা মুখ, ফট করে যদি তোমাকে হারামজাদা বলে ফেলে, তখন তো আর ফেরাতে পারবোনি—

একাবতী। দাদাজী!

ঈশান। দূর ছুঁড়ি। অন্য কথা বল, হারামজাদা বলবি কেন? হারাম মানে শূয়ার—তা জানিস?

সামন্ত। ওসব নীতিকথা থাক, আমি জানতে চাই—ওই বেদেনীকে আমার সঙ্গে পাঠাবি কি না?

রাণা। না।

সামন্ত। না। যদি জোর করে তুলে নিয়ে যাই?

রাণা। রাজকুমার বলে খাতির করবো না।

সামন্ত। কি করবি মূর্খ ছোটলোক?

ঈশান। মূর্খ ছোটলোকেরা যা করে।

সামন্ত। অর্থাৎ—

ঈশান। দোমরা জালে ঢাকা দিয়ে বোয়াল ধরা করবে।

সামন্ত। ঈশান!

ঈশান। আজ্ঞে জাতে জেলে—বিদ্যের বেলায় অষ্টরম্ভা, কপালে লেখা ছোটলোক—হুঁসজ্ঞান কম, কাজেই—

সামন্ত। চুপ কর ছোটলোক!

রাণা। ছোটলোক আমাদের তোমরাই বানিয়েছো। তোমাদের বড় করতে গিয়ে বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ ছোটলোক বলে পরিচিত।

সামন্ত। বুঝেছি—জয়ন্ত এইসব শিখিয়েছে। আচ্ছা, হবে তার ব্যবস্থা, শুধু পিতার খাতিরে কিছুই বলি না বলে মনে করেছে সামন্তপাল দুর্বল; তা নয়, আমি যে কি তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদেরচাঁদ। জানে না মানে? এই নদেরচাঁদ কবরেজের চেয়ে তোমাকে আর কে বেশী জানে। তুমি একটা ঘুঘু ধড়িবাজ, মানে যাকে বলে একেবারে—[সামন্তকে দেখিয়া] এঁ্যা—তুমি—মা—নে আপনি যুবরাজ! দোহাই মশাই, আমি অধম—অনাথ—অবোধ—অর্ব্বাচীন, আপনাকে না দেখেই গোকলো পোদ্দার মনে করে—মানে কুকথাগুলো বলে ফেলেছি। অপরাধ নিবেন না—এই কান মলছি, নাক মলছি, বলেন তো পঞ্চাশ হাত নাকখৎ দিচ্ছি।

সামন্ত। চোপরাও শয়তান—

নদেরচাঁদ। শুধু আমি শয়তান নয়; আমি—আমার বাবা, আমার দেশ, আমার দেশের রাজা, সেই রাজার ছেলে, সব ব্যাটাই শয়তান।

সামন্ত। যতসব ছোটলোকের আড্ডা—

নদেরচাঁদ। আজ্ঞে রাজ্যিটাই ছোটলোকের।

সামন্ত। যাক। শোন ঈশান, তোমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করলাম—সে আমার পরীক্ষা মাত্র, তোমার নাতি রাণার সত্যই সাহস আছে, আর তার সাহস দেখে আমি খুশীই হয়েছি—তাই আমি ওকে রাজকর্ম্মচারীর পদে নিয়োগ করতে চাই।

রাণা। আমি চাকরী করবো না।

ঈশান। আলবৎ করবি, কেন করবি না, কিসের এত ভয়?

যেমন ছোটলোক মনিব—তেমনি হবে ছোটলোক চাকর, তার লেগে আর ভাবনা কি আছে—

সামন্ত। আর বেদেনীর একার জন্য আমি একটা বাড়ী তৈরী করিয়ে দেবো।

নন্দেরচাঁদ। নিশ্চয় দেবেন, যুবরাজ দয়ার সাগর। এই ব্যাটা জেলের পো, গলায় কাপড় দিয়ে যুবরাজকে পেন্নাম কর। এই ছুঁড়ি, বলি হাঁ করে দেখছিস কি? ভাগ্য তোর ফিরে গেল—

একাবতী। বুড়া—

নন্দেরচাঁদ। হেঃ-হেঃ-হেঃ, আরে ছুঁড়ি—তোরা হলি পদ্মফুল, সারকুড়ে ফুটলে কি হবে, দেবতার পায়ে হাজির হতেই হবে।

সামন্ত। তাছাড়া, সে ঘরে ও ছাড়া আর কেউ থাকবে না, ওকে শুধু লক্ষ্য রাখবে সাহসী জওয়ান—রাণা।

একাবতী। বলছিস?

সামন্ত। হ্যাঁ একা! সেই ঘরে তুমি খুশীমত পূজো-টুজো করবে, ইচ্ছামত নাচ-গানের মহড়া দেবে, কেউ বাধা দিতে যাবে না—এমনকি জয়ন্তও না। আমি পিতাকে বলে সব ব্যবস্থা করে দেবো। আচ্ছা, তাহলে চলি রাণা! [প্রস্থানোদ্যত]

ঈশান। আসুন।

সামন্ত। [ফিরিয়া] কিন্তু সাবধান রাণা, একথা যেন আর কারও কানে না ওঠে। তোমাকে আমি প্রচুর অর্থ দেবো, বড় চাকরী দেবো, আমি রাজা হলে তোমাকে দেবো সৈনাপত্যের ভার—বিনিময়ে তুমি শুধু আমারই কথা শুনবে, আর স্থিরচিত্তে মনে রাখবে, এ কথাগুলো যে বলে—সে মণ্ডলগাঁয়ের যুবরাজ—ভবিষ্যতের মহারাজ, তার নাম সামন্তপাল। [প্রস্থান।

নদেরচাঁদ। আমিও চলি ঈশান! বড় যুবরাজের দয়ায় তোদের ভাগ্য ফিরে গেলে তখন যেন তোরা ভুলিস না আমায়। কেমন? হেঃ-হেঃ-হেঃ! [প্রস্থান।

ঈশান। না-না, ভুলবো কেন, দোমরা জালে জড়িয়ে তোমায় ভালুক নাচ নাচাবো।

একাবতী। দাদাজী—

ঈশান। ওরে দিদিভাই! তুই দেখাবি তোর সাপের খেলা, আর আমি দেখাবো ওই ভালুকের খেলা।

[প্রস্থান।

রাণা। কি বুঝলে একা?

একাবতী। বুঝলম। সবাই শিয়ান, সবাই জিয়াদা বড় জাত; কোই বাগ, কোই সিংহী—হাঙ্গর, কোই কুমীর—সবাই এই দরিয়ার তুফান দেখে খুশীসে খেল করতে চায়, কেবল তুই বাদ।

রাণা। আমি বাদ?

একাবতী। হঁ্যা রে ছোকরা—তুই বাদ, তোর সাহস নাই, তোর দীলে ডরের বাসা, তুই একটা—[এদিক ওদিক দেখিয়া] আস্ত বেওকুব।

[প্রস্থান।

রাণা। মানে বোকা! এই—এই একা! শুনে যাও—আচ্ছা এ, কথার জবাব একদিন দেবো, আজ নয়, যেদিন পাবো তোমার মিঠা রাতের নিশান—যেদিন তোমার বুক থেকে ছুটে আসবে নাগচম্পার খসবু।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মণ্ডলগাঁ। প্রাসাদ।

শিকারিণীর প্রবেশ।

শিকারিণী। নাগকন্যা একার জয়গানে মণ্ডলগাঁ আজ মুখর। শুনেছি মেয়েটা ব্রত নিয়েছে সর্প দংশনে মানুষকে আর মরতে দেবে না। ঠাকুরপো গেল কোথায়, জিজ্ঞাসা করতাম—কেমন আছে মেয়েটা—

সামন্তপালের প্রবেশ।

সামন্ত। ভালই আছে শিকারিণী।

শিকারিণী। কে ভাল আছে?

সামন্ত। যার ধ্যান করে তোমার দেবর পাগল হতে চলেছে।

শিকারিণী। স্বামী! এখনও কি তোমার পরিবর্তন হলো না? সে তোমার ছোটভাই—স্নেহের পাত্র, বড় তুমি, তার সঙ্গে এই ব্যবহার কি তোমার সাজে?

সামন্ত। কি সাজে কি সাজে না, তা আমি তোমার কাছে শিখতে আসিনি। আমি শুধু জানতে এসেছি, তুমি আমার স্ত্রী কি না?

শিকারিণী। এতদিন কি অন্যের স্ত্রী ভেবে এসেছো?

সামন্ত। তোমার ব্যবহার আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উচিত আমার সঙ্গে একমত হয়ে পথ চলা।

শিকারিণী। তোমার মত যেমন সরল নয়, পথও তেমনি বাঁকা, আমি বাঁকা পথে চলতে পারি না প্রভু।

সামন্ত। শিকারিণী! এত করে বলছি, এই সুবর্ণ সুযোগ, তুমি একটু সাহায্য করলেই মণ্ডলগাঁয়ের সিংহাসন আমি পেয়ে যাই।

শিকারিণী। যা আপনি এসে ধরা দেবে—তাকে ধরতে এত ব্যস্ত কেন?

সামন্ত। তার মানে?

শিকারিণী। মণ্ডলগাঁয়ের রাজসিংহাসন তো তোমারই, পিতার অবর্তমানে তুমিই হবে এ রাজ্যের রাজা।

সামন্ত। না। পিতা তা চান না, আমি ভাল করে জানি, জয়ন্তের প্রতি পিতার অশেষ স্নেহ—আর জয়ন্তই হবে মণ্ডলগাঁয়ের রাজা।

শিকারিণী। জয়ন্ত এত ছোট নয় স্বামী! সে—

সামন্ত। থাক—থাক, তাকে আমার চেয়ে ভাল তুমি চেনো না, তার হাড়ে হাড়ে কু।

শিকারিণী। সু-দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখেছো?

সামন্ত। দেখেছি। চতুর সে, কৌশলে প্রজাদের মন জয় করে, পিতার সঙ্গে অভিনয় করে—নিজের কাজ হাসিল করতে চায়।

শিকারিণী। তুমিও তাই কর।

সামন্ত। আমি অভিনয় করতে পারি না শিকারিণী।

শিকারিণী। কাজ কি অভিনয়ের! সাদা সরল মন নিয়ে—হৃদয়ে সৎ ইচ্ছা নিয়ে দেশের কল্যাণ সাধন কর, পিতা খুশী হবেন—প্রজারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

সামন্ত। না-না, ছোটলোক প্রজাদের আশীর্ব্বাদ আমি চাই না।

শিকারিণী। তাহলে তাদের অভিশাপ মাথায় নিয়ে সিংহাসনে বসা তোমার চলবে না।

সামন্ত। শিকারিণী! তুমি নারী—রাজনীতি নিয়ে তর্ক তোমার সঙ্গে করতে চাই না, আমি শুধু চাই—

শিকারিণী। তোমার মতে মত দিতে হবে!

সামন্ত। হ্যাঁ।

শিকারিণী। তোমার পথে চলতে হবে।

সামন্ত। হ্যাঁ।

শিকারিণী। তুমি যা বলবে আমাকেও তাই বলতে হবে।

সামন্ত। ঠিক তাই।

শিকারিণী। না। তা আমি পারবো না।

সামন্ত। তোমাকে আমি সোনার মুকুট দেবো।

শিকারিণী। লোহার মাথায় সোনার মুকুট মানাবে না গো!

সামন্ত। তোমার সঙ্গে যে কু-ব্যবহার করেছি, আর তা করবো না।

শিকারিণী। বারো বছরে তোমার সকল কু আমি হজম করে ফেলেছি।

সামন্ত। আমি রাজা হলে তুমিই হবে রাণী।

শিকারিণী। তার চেয়ে তুমি ভিখারী হও স্বামী, তোমার হাত ধরে আমিও হবো ভিখারিণী।

সামন্ত। বাচাল নারি!

শিকারিণী। রাজার অনেক কাজ—অনেক দায়িত্ব। স্বামী! রাজা হওয়ার আগে মানুষ হতে হবে।

সামন্ত। তোমার স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে শিকারিণী, ছোট-ঘরের মেয়ে—শুধু রূপের মোহে পড়ে তোমাকে এনেছিলাম রাজ-প্রাসাদে, অনেক অপরাধ তোমার ক্ষমা করেছি—কিন্তু তা আর করবো না। মনে রেখ—আমি তোমার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, যখন যা বলবো, মাথা হেঁট করে তোমাকে তাই করতে হবে, বুদ্ধিমতীর মত আমার কথা শোন, রাণীর মর্য্যাদা পাবে, আর যদি না শোন তাহলে—

নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। ভিখারিণীর মত পথে পথে কাঁদতে হবে, কেমন?

সামন্ত। পিতা!

নরপাল। দুর্ভাগ্য তোমারা তাই এমন দেবীকে চিনেও চিনলে না।

শিকারিণী। না বাবা, না। উনি ঠিকই চিনেছেন, আমিই ওঁকে চিনতে পারিনি।

নরপাল। পারবে কি করে! মুখে যে ওর মুখোস, কথায় কথায় হেঁয়ালী, বাঁকা পথে পা।

সামন্ত। পিতা! কি বলছেন আপনি?

নরপাল। কি বলছি জিজ্ঞাসা করে এস প্রজাদের কাছে। আমার এক ছেলের নামে জয়ডঙ্কা বাজছে, আর এক ছেলের নামে সকলে মুখ ফেরাচ্ছে—কেন? পার না তুমি সকলের উপরে নিজের স্থান করে নিতে, পার না তুমি সৎকাজ করে—অতীতের পরিচয়কে ভুলিয়ে দিতে?

সামন্ত। তার দরকার নেই।

নরপাল। তোমর না থাকলেও, আমার আছে। আছে ওই মেয়েটার।

সামন্ত। ওর কথা বাদ দিন, ও মানুষ নয়—

নরপাল। দেবী।

সামন্ত। দেবী নয়—দাসী।

নরপাল। দাসী তুমি করতে চেয়েছিলে কিন্তু পারনি।

সামন্ত। পিতা!

নরপাল। সামন্ত! বৃদ্ধ হলেও—মনে রেখ, আমি রাজা নরপাল, তোমরা হয়তো মনে কর আমি কিছু বুঝি না, সে তোমাদের ভুল ধারণা। বুঝি আমি সবই—জানে জয়ন্ত।

সামন্ত। জয়ন্ত—জয়ন্ত! কথায় কথায় জয়ন্তের নাম। কেন. আমি কি আপনার পুত্র নই?

নরপাল। অস্বীকার করলে—[প্রাচীরগাত্রে রক্ষিত রাণীর ছবির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া] তোমার মায়ের অপমান করা হবে।

সামন্ত। তবে কেন আপনি আমাকে দেখতে পারেন না?

নরপাল। তুমি যে দেখতে দাও না মূর্খ।

সামন্ত। জয়ন্ত কি এমন করেছে?

শিকারিণী। কিছুই করেনি।

সামন্ত। তবে কেন তার নামে জয়ডঙ্কা বাজবে।

শিকারিণী। যেখানে বাজছে, সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস।

সামন্ত। থামো শিকারিণী, পিতার আস্কারা পেয়ে তুমি মাথায় উঠে গেছো। সেদিন গুরুর থাঁর সামনে রাজসভায় গিয়ে গলাবাজী করে রাজবংশের মান-সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছো। কি ভেবেছো তুমি?

জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। তুমি যা ভাবতে পারোনি দাদা!

সামন্ত। জয়ন্ত!

জয়ন্ত। আমিও যা চিন্তা করিনি!

শিকারিণী। ঠাকুরপো!

জয়ন্ত। পিতাও যা কল্পনা করেনি, তুমি তাই করেছ বৌদি। মণ্ডলগাঁয়ের ঘুমন্ত শক্তিকে তুমিই তুলেছো জাগিয়ে, ভারতের অতীতের ইতিহাসের অস্পষ্ট ছবি তুমি দিয়েছো রাঙিয়ে, তালুকদারের উদ্ধত একেলা তুমিই দিয়েছো ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে।

সামন্ত। জয়ন্ত! এখনও বলছি সাবধান! বাংলায় মুসলমান প্রাধান্য, সামান্য একটা নারীর কথা শুনে তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে যেও না।

নরপাল। সামন্ত!

সামন্ত। হ্যাঁ পিতা! বেদেনী একাবতীকে আনার জন্য সারা বাংলার মুসলমান ঐক্যবদ্ধ, নবাবকেও তারা ভয় করে না। নবাব হুসেন শাহের রাজত্বে তারা যা সাহস করেনি, নসরৎ শাহের নবাবীতে তারা তাই করবে। এই সময় ক্ষুদ্র শক্তির অহঙ্কারে নিজের ভাল হেলায় হারাবেন না। আমার কথা বাদ দিন, রাজ্যে আমার কোন দরকার নেই। জয়ন্তই যদি রাজা হয়, তাকেও সাবধান করে দিন—আর বলে দিন আপনার বৌমাকে, নারীর—নারী হয়ে থাকাই ভাল, তার পুরুষের মত আচার-আচরণ তাকে বড় করলেও—মণ্ডলগাঁয়ের রাজবংশকে ছোট করছে।

[প্রস্থান।

শিকারিণী। আমাকে ক্ষমা করুন বাবা!

নরপাল। কেন মা, কি করেছো তুমি?

শিকারিণী। হয়তো সব কাজই আমার ভুল হয়ে গেছে, যা করেছি—হয়তো সবই আমার অন্যায়।

নরপাল। এমনি অন্যায় তুমি করে যাও মা।

জয়ন্ত। পিতা!

নরপাল। হ্যাঁ জয়ন্ত, এমনি অন্যায় করেছিল বলেই রাজপুত-রমণীদের স্থান পৃথিবীর সব দেশের রমণীর মাথার উপরে।

শিকারিণী। না-না বাবা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মনটা যেন কেমন ভেঙে পড়েছে, আপনি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

নরপাল। কেন মা! আমি কি তোমার বাবা নই? আমি কি তোমাকে মেয়ের মত দেখি না?

শিকারিণী। বাবা!

নরপাল। বুড়ো ছেলের যদি কোথাও ভুল হয়, সে ভুল তুই ভেঙে দিস মা। বয়েস হয়েছে, হয়তো আর বেশীদিন তোদের কাছে থাকতে পারবো না। এ সময় আমাকে ফেলে চলে যাবি মা?

শিকারিণী। [নরপালের পায়ের তলায় বসিয়া] আমার অন্যায় হয়েছে বাবা—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কথা দিচ্ছি—আপনি নিজে না বললে কখনও বাপের বাড়ী যাবো না।

নরপাল। ওঠ মা—ওঠ, তুই গেলে কি আমার সংসার চলে! বুদ্ধিহীন সামন্তকে তুই মানুষ কর, তার চোখে জ্বেলে দে জ্ঞানের আলো। আমার জয়ন্তকে তুই দেবর মনে না করে ছেলের মত দেখিস। এর মা নেই, আমিও বেশীদিন থাকবো না। তাই—তুই

ওর মা হয়ে থাক। কোন কারণেই তোর এই দুষ্টু ছেলেটাকে তুই যেন ধূলোয় ফেলে দিস না মা—ধূলোয় ফেলে দিস না।

[জয়ন্তকে শিকারিণীর হাতে সঁপিয়া দিয়া প্রস্থান।

শিকারিণী। জয়ন্ত—

জয়ন্ত। মা! [শিকারিণীকে প্রণাম করিল]

শিকারিণী। দূর বোকা! অতবড় ছেলের মা হওয়া কি সোজা কথা! লোকে শুনলে বলবে কি? ওঠ—ওঠ, কেউ দেখে ফেললে— [তুলিতেছিল]

মঞ্জুরীর প্রবেশ।

মঞ্জুরী। হাসবে যে।

শিকারিণী।
জয়ন্ত। } মঞ্জু!

মঞ্জুরী। ও—তুমি! আমি ভেবেছিলাম বড়ঠাকুর।

শিকারিণী। ছোটবৌ!

মঞ্জুরী। হ্যাঁ দিদি। যা দেখলাম—এ স্বামী-স্ত্রীতেই সম্ভব, দেওরকে নিয়ে এত মাতামাতি—

জয়ন্ত। মঞ্জু!

মঞ্জুরী। চোখ রাঙিয়ো না। রূপকথার গল্প শুনিনি, লোকের মুখে কাহিনী শুনিনি, নিজের চোখে দেখেছি।

শিকারিণী। কি দেখেছিস মঞ্জু?

মঞ্জুরী। যা না-দেখা উচিত ছিল।

জয়ন্ত। তার মানে?

মঞ্জুরী। বাংলা অভিধানের কলঙ্কিত ভাষা।

জয়ন্ত। মঞ্জুরী!

শিকারিণী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ মঞ্জু! এই তোর মন, এই তোর চোখ, এই তোর ধারণা?

মঞ্জুরী। মন যা ভেবেছে—চোখ যা দেখেছে—ধারণা যা করেছি, তা কি ভুল বলতে পারো দিদি?

জয়ন্ত। একেবারে ভুল।

মঞ্জুরী। না, ভুল নয়। ভুল যদি হবে, তাহলে আমার এই রূপ কেন তোমাকে ভোলাতে পারলো না, আমার এই যৌবন-পশরা কেন তোমাকে মুগ্ধ করলো না? ভুল যদি বলছো—তবে কেন তোমাকে হাজারবার ডেকে একবার পাই না?

শিকারিণী। ভগবান! এ তুমি কোথায় নিয়ে এসেছো প্রভু, একি ভাষা শোনাচ্ছো তুমি আমায়? আমি যাকে ভাইয়ের মত দেখি—না-না-না, সব মিথ্যা, সব ভুল, সব মরীচিকা! আমি না বুঝে অন্যায় করেছি, আজ থেকে আর তোর স্বামীকে কাছে ডাকবো না—তোর স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বলবো না। আমি পাষাণ দিয়ে বুক বাঁধবো—অশ্রু দিয়ে আগুন নেভাবো—হৃদয়ের সকল দুর্বলতা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বুঝিয়ে বলবো—ফুলের বনে যে দীপ জ্বালিয়ে ছিলি, ভুলের ঝড়ে সে দীপ নিভে গেছে।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। বৌদি! বৌদি! দেবী!

মঞ্জুরী। দেবী! সতী—সাবিত্রী—

জয়ন্ত। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও শয়তানী!

মঞ্জুরী। বড় গায়ে লেগেছে, না? আহা, বড় মধুর স্বপ্ন—মাঝপথে ভেঙে গেল!

জয়ন্ত। ভেঙে গেল—স্বপ্ন আমার ভেঙে গেল! দূর যেখানে হয়ে এসেছিল নিকট, আঁধার যেখানে ভরে আসছিল আলোয়, পর যখন হয়ে উঠছিল অতি আপন—সেই স্বর্ণবিন্দু রক্তবেদী স্নেহের সোপান উড়ে গেল—ফেটে চৌচির হয়ে গেল, প্লাবনে ভেসে গেল। যার ধ্বংস ফুৎকারে, তাকে আমি—[মঞ্জুরীর গলা টিপিতে গেলে মঞ্জুরী আর্ত্তনাদ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল] না-না, এ আমি কি করছি? শুনে রাখো রূপগর্ব্বিতা! যে লোভের তাড়নায় দেবীকে করলে অপমান, যে খেয়ালের খেলায় ফুলকে করলে ভুল, যার সঙ্গলিপ্সার স্বর্গকে পাঠালে নরকের অন্ধকারে, সে লোভলিপ্সা—খেয়াল তোমার মিটবে না—আমাকে তুমি পাবে না।

মঞ্জুরী। নিশ্চয় পাবো।

জয়ন্ত। রাজার মেয়ে, রাজার বৌ—চাইলে হয়তো আকাশের চাঁদ পাবে; কিন্তু সেই চাঁদ যার বুকে ঘুমিয়ে থাকে—সেই আকাশ তুমি পাবে না। [প্রস্থান।

মঞ্জুরী। কেন পাবো না? আমার কি রূপ নেই! আমার কি যৌবন নেই? আমার কি মোহ নেই? আছে! আমি তাদের ঘুম ভাঙাবো—জাগিয়ে তুলবো—আলোর দুয়ার খুলে দেবো, দেখবো—পতঙ্গ আসে কিনা! তাতেও যদি না আসে, তাহলে বুঝবো পতঙ্গ এখনও শিশু—এখনও তার পাখা গজায়নি। অপেক্ষা করবো, পাখা গজাবে, তারপর যদি না আসে, তখন—আগুনের শিখা তার আশায় বসে থাকবে না, লেলিহান শিখা বিস্তার করে মূর্খ পতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হাসান মঞ্জিল।

হাসান খাঁর প্রবেশ।

হাসান। আগুন—আগুন, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দাও কাফের হিন্দুদের ঘরবাড়ী। টিকি ধরে টেনে নিয়ে এস ভণ্ড ব্রাহ্মণ-গুলোকে, তারপর তাদের চাবুক মারো, মৌলভী ডেকে কলমা পড়িয়ে দাও। যদি কেউ বাধা দিতে আসে—মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে মন্দির সমেত তাকে তোপের মুখে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও।

শুকুর খাঁর প্রবেশ।

শুকুর। পারলাম না ভাইসাহেব, পারলাম না।

হাসান। কি পারলে না শুকুর খাঁ?

শুকুর। কাফের হিন্দুদের মনসা মন্দিরটা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে।

শোভানাবানুর প্রবেশ।

শোভানা। কেন পারলে না ভাইজান। তোপের বারুদ কি ফুরিয়ে গেছে?

শুকুর। না।

হাসান। তবে পারলে না কেন? কোন বে-আদব বাধা দিয়েছে? পারলে না তার মাথাটা কেটে আনতে?

হোসেন খাঁর প্রবেশ।

হোসেন। বে-আদবের মাথাটা কেটে আর আনতে হবে না ভাইজান! মাথাটা নিয়ে সে নিজে হাজির হয়েছে।

হাসান। কৈ, কোথায় সেই কমবক্ত?

হোসেন। কমবক্ত তোমাদের সামনে।

হাসান। হোসেন! আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে আমার নোকরদের কাজে বাধা দিয়েছিস?

হোসেন। তাদের জবাই করলেই ভালো করতাম।

শুকুর। শুনলে ভাইসাহেব—

শোভানা। শুনবে—শুনবে আবার কি! তুমি একটা অপদার্থ।

শুকুর। শোভানা!

শোভানা। তুমি না সারে তালুকের সিপাহশালার, তোমাকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনবে না? জ্যান্ত আনতে বললে মেরে আনবে না? তওবা—তওবা! তোমার গাফিলতিতেই আজও মন্দিরের চূড়োগুলো আদৎ দাঁড়িয়ে আছে, এখনও আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে—তোমার দুর্ব্বলতার জন্যই এখনও অক্ষত রয়ে গেছে কাফের হিন্দুদের মাথাগুলো।

হোসেন। তাদের মাথাগুলো লোহার তৈরী কিনা—

হাসান। হোসেন!

শুকুর। দেখলে ভাইসাহেব? এবার আমার কথা বিশ্বাস হলো তো? বলেছিলাম না—তোমার পীরসাহেব ভাই সেই বেদেনীকে শাদী করতে চেয়েছিল।

হোসেন। মাথার উপর আঁসমান আছে শুকুর খাঁ!

শোভানা। আর পায়ের তলায় জমিন যে তোমার গুনাহে বসে যাচ্ছে সাধুপুরুষ। জরিয়াদের মুখে শুনেছি, তুমি সরাব খাও, বাঈজীদের কাছে রাত কাটাও—বেদেনী কসবীর সঙ্গে চেয়েছিলে মহব্বত করতে।

হোসেন। কথাগুলো চোখ বুজে বলছো তো ভাবী?

হাসান। চোপরাও কাফের! আমি শুনেছি—হাফিজ খাঁ কামান নিয়ে তৈরী ছিল, কাফের হিন্দুগুলো ভেড়ার পালের মত পালিয়ে গেল, কামানে আগুন দেবে—এমন সময় মন্দিরের সামনে হাজির হলে তুমি।

হোসেন। ঠিকই শুনেছো।

হাসান। তাহলে কি বুঝবো তুমি আমার দুশমন?

হোসেন। ভাই ছাড়া আর ভাইয়ের দুশমন কে হবে বলো?

শোভানা। দেখছো কাজী সাহেব, এখনও কেমন দেমাক দেখছো?

হোসেন। হবেই তো—হবেই তো ভাবী, চিরাগ যে নেভার আগেই দপ করে জ্বলে।

হাসান। থামো মূর্খ, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার খানদানী বংশের ইজ্জত দোজাকে ডুবিয়ে দিয়েছো, আমার বিলকুল কাজে দিয়েছো বাধা; আমি বেঁধে আনতে বললে তুমি খুলে এনেছো, আমি শাসন করতে বললে তুমি সোহাগ করেছো। এত সাহস তোমার, এত বে-আদব তুমি, এত নীচে তুমি নেমেছো! কোথাকার এক কসবী বেদেনী—যে আমার বাঁদী হবারও অযোগ্যা, তুমি গিয়েছিলে তার সঙ্গে আসনাই করতে!

শুকুর। শুধু তাই নয়, আমি নিষেধ করেছিলাম বলে আমাকে করেছে বে-ইজ্জত।

শোভানা। আবার খনিস জোবেদার মুখে শুনলাম, কাফের হিন্দুরা যেখানে রামায়ণ-মহাভারতের বয়েত আওড়ায়, উনি সেখানে গিয়ে বসেন।

হাসান। এসব ফরিয়াদ সত্য?

হোসেন। বর্ণে বর্ণে।

হাসান। কেন যাও?

হোসেন। শুনতে।

শোভানা। কি শোনবার আছে সেখানে?

হোসেন। আছে ভাবী আছে! রামায়নের মধুক্ষরা কাহিনী। যে কাহিনী শুনে হিন্দুরা চোখের পানী ফেলে, সীতার অশ্রু ঝরা কাহিনী গাইতে গাইতে—আসমানে উড়ে চলে চিড়িয়ার দল। লব-কুশের দুঃখের পাঁচালী শুনে চোখ মোঝে কত সীতা মা।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। আমার কি মনে হয় জানো ভাইজান? শকুনির চক্রান্তে যেমন করে ধ্বংস হয়েছিল মহাভারতের কৌরবকুল, ঠিক তেমনি করে আমাদেরও কোন পরমাত্মিয়ের তোষামোদে আর চোখের পানীতে—এই কাজীবংশ নির্ম্মূল হয়ে যাবে। তাই, যখন আমি কান পেতে শুনি রামায়ন আর মহাভারতের কথা, তখনই চোখ বুজে মনে মনে বলি—ওগো চক্রধারী নারায়ণ! ভুলিয়ে দাও—ভুলিয়ে দাও মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিষাক্ত বৈশম্য।

হাসান। শুকুর খাঁ—

শুকুর। ভাই সাহেব!

হাসান। সহরৎদার রহিম আলিকে তলব দাও।

শোভানা। তালুক ভাগ হবে।

হোসেন। ভাবী!

হাসান। হ্যাঁ, আর সহরৎদার সে খবর সহরৎ করে দেবে তালুকের সড়কে সড়কে।

হোসেন। ভাইজান!

শোভানা। হ্যাঁ হোসেন খাঁ, তাছাড়া উপায় নেই, তুমি কাজী সাহেবের ভাই হবার যোগ্য নও।

হোসেন। সাবাস ভাবী, সাবাস! ছিঁড়েছো তাহলে কলিজা, চুষেছো তাহলে দীলের রক্ত। ভাইজান! তাহলে তোমার আমার রক্তের সম্বন্ধ ওই ভাবীর চোখের পানিতে মুছে গেল—কেটে গেল তোমার আমার সম্পর্কের সূত্র। যে বেহেস্তী মাটিতে দুই ভাইয়ে একসঙ্গে চলেছি, যার হাজার কথা দুই ভাইয়ে একসঙ্গে বলেছি, যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে তোমার আমার আব্বা আম্মাজান—সেই জন্মভূমি মাটির আম্মাকে—

হাসান। ভাগ করে দিলাম।

হোসেন। তাহলে তালুক ভাগ হয়ে গেল?

হাসান। হ্যাঁ, হয়ে গেল, সাতের কিস্তির পরগণা ইসলামপুর মুসলমান প্রধান—তাই সেটা থাকলো আমার। আর—

হোসেন। তিনের কিস্তির পরগণা কৃষ্ণনগর হিন্দুপ্রধান—সেটা হলো আমার।

শুকুর। বহুৎ আচ্ছা ভাগ হয়েছে—

শোভানা। কিছু মনে করো না ছোট সাহেব! কাজী সাহেব তোমার ভাই—সে তো কাঁদবেই; আমি পরের মেয়ে, আমার চোখেও পানী ঝরছে—তবু উপায় নেই। হাকিম কাঁদলেও আইন কাঁদবে না। আইন—আইন।

গহরজানের প্রবেশ।

গহর। চোপরাও শয়তানী! যে আইনের বুলি আওড়াচ্ছিস, সেই আইন মানুষেই পয়দা করেছে—তোর আইন মানুষকে পয়দা করেনি।

শুকুর। তুমি আবার এখানে কেন বে-আদব!

গহর। হুঁসিয়ার হারামীর বাচ্চা! কদম সামালকে চল, জবান সামালকে বল—নইলে পয়জার মেরে তোর মাথা উড়িয়ে দোব, শয়তানী বহিনকে নিয়ে বেরিয়ে যা মঞ্জিল থেকে, চলে যা সেই বাঁদরের দেশ আফ্রিকায়। তোরা যেমন জানোয়ার তেমনি জানোয়ারের রাজ্যেই থাকগে, এই মানুষের মুলুকে তোদের থাকা চলবে না।

শোভানা। ভাইজান—

শুকুর। ভাই সাহেব! বৃদ্ধ রাজদ্রোহী—

হাসান। হলেও সাতখুন মাফ; কারণ বেগম সাহেবার বাপজান কিনা!

শোভানা। বাপজান! এখনও সামলে চল, নইলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে—

গহর। কয়েদ করবি? তাই কর দেখি—কেমন তোদের রাজ্য, কেমন তোদের আইন। ওঃ, ভারি রাজ্য—তার আবার বিদ্রোহী! ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটি আবার আইন শেখাচ্ছে—

শুকুর। }
শোভানা। } বাপজান!

গহর। চোপরাও হারামীর বাচ্চা। তালুকদার! তুমি তো হাবসীদের মত গরিলার জাত নও, তুমি তো বাঙালী, বাংলার

ভাত তোমার পেটে—বাংলার কাহিনী তোমার দাঁতে। ইতিহাস তো পড়েছো, মনে করে দেখ—মহম্মদ বিন কাশিম থেকে শুরু করে কত বে-আদব কতভাবে হিন্দুগুলোকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছে, তবু হলো কি ধ্বংস? অত্যাচার, অবিচার, জিজিয়া কর—কত ঝড় বয়ে গেছে এই আপন-ভোলা জাতটার উপর দিয়ে, তবু তারা নড়েনি—মরেনি, তোমাদের দুশমন ভাবতে শেখেনি; এখনও তারা দরগাতলায় সিন্নি মানে, ওলাবিবির পূজো দেয়, সত্যপীরের গান শোনে।

শুকুর। বেরিয়ে যাও বেয়াদব কাফের!

হোসেন। খবরদার শুকুর খাঁ, তোমার বাপজান তোমার কাছে এনকারের পাত্র হলেও—আমার কাছে সে আত্মীয়।

শুকুর। হোসেন খাঁ—

শোভানা। তুমি সরে যাও ভাইজান, আমি দেখি বৃদ্ধ বেওকুবটা শায়েস্তা হয় কিনা! [চাবুক মারিতে উদ্যত হইলে হোসেন তাহা কাড়িয়া লইল]

হোসেন। হুঁসিয়ার বেগম সাহেবা! তোমার চোখের পানী ভাইজানকে ভোলাতে পারে—আমাকে পারে না। বে-আদবী করলে ভাবী বলে খাতির করতে পারবো না।

শোভানা। করলে কি গো, আমার গায়ে হাত দিলে! আমার যে মান-ইজ্জত সব গেল!

মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। সে তো আগেই গেছে আম্মা!

শোভানা। কি বললি হতভাগা?

মামুদ। বচপনে ঘুঁটে কুড়ুতে, রাখালের বেটি তুমি, তোমার আবার মান-ইজ্জত কোথায় ?

শুকুর। মামুদ !

মামুদ। নোকরী করগে মামা সাহেব, বোনাইয়ের ভাত তিতো লাগে না ?

হাসান। চোপরাও বাচাল !

মামুদ। ও বাপজান, জেগে আছো ! আমি ভাবলাম ঘুমুচ্ছো বুঝি ।

গহর। দাদু !

মামুদ। [মাকে দেখাইয়া] ওই মেয়েটা, [মামাকে দেখাইয়া] ওই ছেলেটা তোমার ?

হোসেন। মামুদ !

মামুদ। এখনও কবরখানায় দাঁড়িয়ে কেন চাচাজান, দাদুকে নিয়ে তোমার তিনের পরগণায় চলে যাও।

হোসেন। তুমি যাবে না আমার সঙ্গে ?

মামুদ। না চাচা ! আমি এদের ছেলে, তোমার বেহেস্তী তালুক আমার ছোঁয়ায় দোজাক হয়ে যাবে। তুমি যাও—দাদু যাক, আমি এখানে থেকে তোমার কথা মনে করবো, তোমার দেওয়া কিতাব পড়বো, তোমার শেখানো গান গেয়ে দুনিয়ার মালিকের কাছে দোয়া প্রার্থনা করবো, কেঁদে কেঁদে বলবো—

গীত।

দোয়া কর তুমি শুধু।
বাংলার বিষ শিরে তুলে নিয়ে দিতে পারি যেন মধু।
খোদা ভগবান, জল আর পানী এই নিয়ে কাটাকাটি,
চোখের পানীতে রক্ত মুছিল ভাগ হয়ে গেল মাটি ;
এ গুনাহ তুমি ক্ষমা করো প্রভু—ঘুচিয়ো বিভেদ যাদু।

গহর। দাদু! দাদু! এ গান যেন কখনও বে-ইমান হসনি, এই গান গেয়ে যার কাছে দোয়া প্রার্থনা করবি—সেই হলো সংসারের মালেক। বিরাট তার সংসার, লাখ-লাখ তার ছেলেমেয়ে—কারও নাম রাম, কারও নাম রহিম; কেউ করে পূজো, কেউ পড়ে নমাজ; রেবা তোলে ফুল, রাবেয়া গাথে মালা; মুশাফির জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি জাত, তারা হেসে বলে আমরা মানুষ। খোদা ওঠে হেসে, হেসে ওঠে খোদার দুনিয়া। সেই দুনিয়ার মানুষ তুমি, তুমি যেন ইসলাম হতে যেয়ো না—হিন্দু হতে চেয়ো না, হিন্দু-মুসলমান সবার উপর যার ঠাঁই, তুমি সেই মানুষ হয়ে থেকো দাদু—মানুষ হয়ে থেকো।

হোসেন। চলুন—আর দেরী করবেন না।

গহর। যাবো বলছো, বেশ চল। চললাম দাদু, চললাম কাজী সাহেব! [প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিয়া] হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছি—যাবার সময় ছেলেমেয়ের সঙ্গে শেষ কথা বলে যাই—ওরে শুকুর, তুই মনে করিস—আশমান থেকে তোর পয়দা। আর শোভানা, কত কষ্ট দিয়েছি তোদের—কত ভাত খেয়েছি আমি, আর খাবো না। এইবার আমার নামে একটা কুকুর পুষিস। আমাকে যে ভাতগুলো দিতিস, সেগুলো সেই কুকুরটাকে দিস।

[প্রস্থান।

শোভানা। ভাইজান! ডাকো—বাপজানকে ডাকো—

হোসেন। সে কি বেগম সাহেবা! ফেলা থুথু আবার গিলবে, ইজ্জতে বাধবে না?

শুকুর। শুনলে ভাইসাহেব!

হোসেন। ভাইসাহেব অনেক শুনেছে শুকুর খাঁ—এবার তোমরা

শোন, বেগম সাহেবাকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার তালুকে সফর করতে যেও, গরীব হলেও আমি তোমাদের অসম্মান করবো না। মামুদ! তুই এখানেই থাক, যেদিন বুঝবো, না হলে আর চলছে না—সেদিন এসে তোকে নিয়ে যাবো। [মামুদের চুমা খাইতেছিল সহসা শোভানা মামুদকে সরাইয়া লইল]

শোভানা। না। কখনও মামুদ তোমার তালুকে যাবে না।

হোসেন। শুধু মামুদ কেন বেগম সাহেবা, মামুদের বাপকে যেতে হবে।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। হবে ভাইজান, যেতে তোমাকে হবে। এরা তোমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে চিনি। তুমি যে আমার অর্দ্ধেক, তোমার অর্দ্ধেক আমি। বাইরের মানুষ ওই বেগম সাহেবার চোখের পানী, রূপের মোহ বেশীদিন তোমার আমার রক্তের সম্বন্ধ ঢেকে রাখতে পারবে না। তোমার চোখে যে আমার দৃষ্টি, আমার দীলে যে তোমার স্পন্দন, তোমার-আমার হাসান-হোসেনের নাড়ীর মধ্যে দেওয়া আছে যে মহব্বতের ফাঁস। ভাবীর চোখের পানী শুকিয়ে যাবে—তার রূপের মোহ ফুরিয়ে যাবে, তবু তোমার আমার রক্তের সম্বন্ধ—মহব্বতের ফাঁস—দীলের সঙ্গে দীলের বাঁধন কিছুতেই খুলতে পারবে না।

হাসান। হোসেন!

হোসেন। আদাব ভাইজান!

শোভানা। ছোটসাহেব!

হোসেন। আদাব ভাবীসাহেবা!

শুকুর। হোসেন খাঁ!

হোসেন। আদাব সিপাহশালার শুকুর খাঁ। [প্রস্থানোদ্যত]

মামুদ। চাচাজান!

[হোসেন ফিরিল এবং নির্ব্বাক হইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া মামুদকে দেখিতেছিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরা। পরে ধীরে ধীরে আসিয়া মামুদের মুখচুম্বন করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিল।]

মামুদ। চাচাজান!

হাসান। দূর মূর্খ! শুভযাত্রায় পিছু ডাকিস না, ডাকলে তার অমঙ্গল হবে যে!

মামুদ। বাপজান!

হাসান। ওরে মামুদ! দেখ তো সত্যি সে গেল, না আমাকে ভয় দেখাল। যা—যা, ছুটে যা। যদি দেখিস এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে তাকে বলবি, বাপজান বললে—[ইতস্তত চিন্তা করিয়া] হ্যাঁ রে মামুদ, কি বলবি বল দেখি?

মামুদ। বলবো—চাচা, তুমি জলদী পালাও—এক মুহূর্ত্ত আর এ কবরখানায় থেকো না।

[প্রস্থান।

হাসান। সেই ভাল—সেই ভাল। আমি শক্ত পাথর, আমি কবরে আছি বলে সে থাকবে কেন—আমি কাঁদছি বলে সে কাঁদবে কেন—হাসান বেওকুব বলে হোসেন বেওকুব হবে কেন?

শোভানা। শোভানাল্লা! দরদ যে উথলে উঠলো।

হাসান। শোভানা! [স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া] না-না বেগম সাহেবা, তোমার চোখের আগুন নেভাও, তোমার রূপের চিরাগ জ্বালো;

সত্যি করে না পারো, মিছে করে কাঁদো ; চোখের আগুন অভিনয়ের পানীতে ছেয়ে ফেল। পানী আনো—আনো পানী, তোমার চোখের পানী দিয়ে আমার সঙ্গে হোসেন খাঁর রক্তের সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দাও—ঘুচিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

শুকুর। সাবাস বহিন, সাবাস! খুবসুরৎ তোর অভিনয়—বহুতাচ্ছা তোর হেকমত।

শোভানা। এই সবে শুরু—এখনও অনেক কাজ বাকী।

শুকুর। শোভানা!

শোভানা। শোন ভাইজান, বাদশা বাবরের সঙ্গে তুমি যোগা-যোগ রাখবে—আখেরে তামাম বাংলা আমার দখলে রাখতে চাই। কাজী সাহেবের দীলে যেটুকু দরদ আছে, আমি সেটুকুও মুছে দেবো। হোসেন খাঁর সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ এখনও রয়ে গেছে, শোভানাবানু পয়জার সমেত পা দিয়ে সেই রক্তের দাগ ঘুচিয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

শুকুর। রক্ত! রক্তের চেয়েও লাল—সুরৎ। সুরতের চেয়েও লাল—যৌবন। সেই যৌবন আছে নাগিনী একার, তাকে আমি বে-ইয়াদ হতে পারি না, তাকে আমার চাই। বে-কায়দায় যে হুরী হাতছাড়া হয়ে গেছে, যেমন করেই হোক তাকে আবার হাতের মুঠোয় আনতে হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রসাদ কক্ষ।

সামন্তপালের প্রবেশ।

সামন্ত। না—না—না। যে পথে আমি চলেছি, সেই পথই আমার ঠিক, সেই পথেই আমাকে চলতে হবে—তাছাড়া উপায় কি! পিতার এক চোখো বিচার, স্ত্রীর আদর্শবাদ, জয়ন্তের স্বার্থপরতা আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে। আমি রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র অথচ রাজ্যে আমার কোন অধিকার নেই—যত অধিকার সেই অর্ব্বাচীন জয়ন্তের হাতের মুঠোয়। স্বার্থপর জয়ন্ত—

শিকারিণীর প্রবেশ।

শিকারিণী। ওগো, কি হলো! ঠাকুরপোর কি হলো! কেন তুমি তার নাম করে থেমে গেলে? তবে কি—না-না, এ কথনও হতে পারে না। ওগো, কেমন আছে ঠাকুরপো তুমি জানো?

সামন্ত। কেন, কি হয়েছে তার?

শিকারিণী। সেকি! তোমার ছোটভাই আজ সাতদিন বিছানায় পড়ে আছে, কেউ তাকে একদানা খাদ্য খাওয়াতে পারেনি, তেমন চেহারা শুকিয়ে কালি হয়েছে—তুমি তার কিছুই খোঁজে রাখো না?

সামন্ত। রাখবার দরকার নেই।

শিকারিণী। সে তোমার ভাই নয়?

সামন্ত। ভাই! ভাই হলেও—শত্রু। [মদ্যপানে টলিতেছিল]

জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভাইয়ের চেয়ে বড় শত্রু সংসারে আর নেই দাদা। রামায়ণ খুলে দেখ, বিভীষণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; মহাভারত খুলে দেখ, দুর্য্যোধন তার জ্বলন্ত প্রমাণ—[শিকারিণীকে দেখিয়া] কে! ও—আমি ভেবেছিলাম দাদা একা আছে। যাক, কিছু মনে করো না দাদা, আমি যেমন এসেছিলাম তেমনি চলে যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

শিকারিণী। ওগো, ডাকো—ডাকো, টলছে—পড়ে যাবে—

জয়ন্ত। [ফিরিয়া] পড়ে যাবো নয়, পড়ে গেছি। একমাস আগে ছিলাম হিমালয়ের চূড়োয়—একমাস পরে আজ পড়ে গেছি একেবারে সমুদ্রের অতল তলে। বেশ ছিলাম—সে ছিল এক অন্য পৃথিবী—তার আকাশ-মাটি-চন্দ্র-সূর্য্য সব ছিল আলাদা; কিন্তু কোথাকার এক রাক্ষসী আমার হাত ধরে টেনে নামিয়ে আনলো এই গভীর অন্ধকারে। জানো দাদা, আমি বেশ বুঝছি, এখানে আমার মৃত্যু—

শিকারিণী। আঃ—[শিহরিয়া উঠিল]

জয়ন্ত। কিন্তু কিছুতেই পালাতে পারছি না। যত চেষ্টা করছি, ততই পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলছে সর্ব্বনাশী রাক্ষসী।

সামন্ত। কে সে রাক্ষসী?

জয়ন্ত। সংসার।

সামন্ত। সংসার!

জয়ন্ত। হ্যাঁ দাদা, সংসার রাক্ষসী, সমাজ তার বিরাট মুখ—

মানুষগুলো তার এক একটা রক্তমাখা দাঁত—আর সেই রাক্ষসীর পেটের নাড়ী কারা জানো? এইসব নারী। এরা কখন যে বিষ ঢেলে তোমার মধুর হৃদয় বিষিয়ে দেবে তুমি তার কিছুই বুঝতে পারবে না।

শিকারিণী। ওগো, কবিরাজ ডাকো, ওর যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জয়ন্ত। মাথা যারা খারাপ করেছে—তাদের চিকিৎসা আগে দরকার, যার মাথা খারাপ তার চিকিৎসা পরে।

সামন্ত। এই মাতাল হবে মণ্ডলগাঁয়ের রাজা!

জয়ন্ত। দাদা!

সামন্ত। এসব তোর অভিনয়।

জয়ন্ত। অভিনয়!

সামন্ত। নিশ্চয়। অভিনয় করে তুই পিতাকে ভুলিয়েছিস, অভিনয় করে প্রজাদের হাত করেছিস, আমার একান্ত যে নিজের—সেই স্ত্রীকেও তুই অভিনয় করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিস।

শিকারিণী। কি বলছো তুমি?

সামন্ত। থামো, তোমাদের এই মূক অভিনয় আমি বুঝি না? যেন কেউ কাউকে চেনো না, অথচ ওই জয়ন্তই তোমার স্বামীকে পথে বসাবার জন্য প্রস্তুত।

জয়ন্ত। [নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরি বাহির করিয়া] দাদা!

শিকারিণী। একি, ছুরি!

সামন্ত। এত সাহস তোর—তুই আমাকে খুন করবি? কে আছিস—

জয়ন্ত। চুপ কর দাদা, এখনও প্রাসাদের সকলে জাগেনি, ঘুম ভাঙেনি প্রভাত সূর্য্যের, আমি—তুমি আর তোমার স্ত্রী ছাড়া এখানে কেউ নেই। এই সুবর্ণ সুযোগ, এই সুযোগে এই ছুরিটা তুমি আমার বুকে বসিয়ে দাও।

সামন্ত। জয়ন্ত!

শিকারিণী। না—না, ওগো না—তুমি চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও স্বামী!

জয়ন্ত। যাবার পথে কাঁটার মত বসে আছি আমি। দাদার স্বপ্ন এই কাঁটার ধ্বংস—নাও দাদা, এই অবসর—কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, পশু-পাখীরাও টের পাবে না—বসিয়ে দাও ছুরি, ফিনিক দিয়ে ঝরে পড়ুক তোমার শত্রুর রক্ত, তুমি সেই রক্তমাখা ছুরি মুছে—সেই রক্তের রাজটিকা কপালে এঁকে—সেই রক্ত দু'পায়ে দলে রাজা হয়ে বসো রাজ-সিংহাসনে। [সামন্তের পদতলে বসিয়া ছুরি আগাইয়া দিতে উদ্যত হইল]

শিকারিণী। [ছুরি কাড়িয়া লইয়া তীব্রকণ্ঠে] জয়ন্ত!

জয়ন্ত। কে! [উঠিয়া দ্রুতপদে দেওয়ালে রক্ষিত মায়ের তৈল-চিত্রের কাছে গিয়া ভাঙাকণ্ঠে বলিল] মা! তুমি আমায় ডাকছো? কেন মা, কেন তোমার শাসনের সুর? কি অপরাধ করেছি আমি? তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে বসাতে আমি যদি বুকের রক্ত ঢেলে দিই—সে কি আমার অন্যায়? না-না, অন্যায় নয় মা, তুমি স্নেহের দৃষ্টিতে চাও—স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকো—আমি এপারের হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে তোমার কাছে ওপারে চলে যাই।

সামন্ত। অভিনয়—অভিনয়, সবটুকু ওর অভিনয়। এ নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তুই, আর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—ওই শিকারিণী।

শিকারিণী। স্বামী।

সামন্ত। সামন্তপাল মূর্খ নয় নারী। সে জানে কোন চোখে কোন দৃশ্য দেখতে হয়। যে অ-নামিকা নাটক অভিনয় হয়ে চলেছে তার সব দৃশ্য আমি দেখলাম, আর দেখে স্পষ্ট করে বুঝলাম—

শিকারিণী। কি বুঝলে?

সামন্ত। এ নাটকের নায়ক জয়ন্তপাল।

জয়ন্ত।
শিকারিণী। } কি বললে?

সামন্ত। আর তার নায়িকা—সুন্দরী শিকারিণী।

[দ্রুত প্রস্থান।

[জয়ন্ত ও শিকারিণী আর্ত্তনাদ করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া
ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।
ক্ষণকাল পরে শিকারিণী
তারস্বরে বলিল]

শিকারিণী। না—না—না, আর চিন্তা নেই, আর ভাবনা নেই, সংসারের কাউকে আর ভয় করি না। ধ্বংসের নাটক মধ্যপথে, ভবিষ্যত এর কালোয় ভরা, রক্তে রক্তে লাল—তার চেয়ে দর্শকের ভাষায় দর্শকের মনোনীত নায়িকার জীবন এখানেই শেষ হয়ে যাক। [হস্তস্থিত ছুরি নিজের বুকে বসাইতে উদ্যত হইল]

জয়ন্ত। [তীব্র গতিতে ছুরি সহ শিকারিণীর হাত ধরিয়া] ফেলে দাও—ফেলে দাও ছুরি!

শিকারিণী। না-না, ছেড়ে দাও আমাকে, বেঁচে থাকা আমার চলবে না, ছেড়ে দাও। আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষ, নিশ্বাসে আগুন, আমি মানবী নয়, আমি—

মঞ্জরীর প্রবেশ।

মঞ্জরী। দেবী—স্বর্গের দেবী! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শিকারিণী। } মঞ্জু! [শিকারিণীর হাত থেকে ছুরি পড়িয়া গেল]
জয়ন্ত। }

মঞ্জরী। মাটির মেয়ে মঞ্জরী, দেবীকে দেখতে এলাম।

জয়ন্ত। কি দেখলে এসে?

মঞ্জরী। সেই স্বর্গীয় দৃশ্য।

জয়ন্ত। [পতিত ছুরি কুড়াইয়া] শয়তানী! যে পাপচক্ষে তুমি শুধু বিষদৃশ্য দেখছো, সেই পাপচক্ষু তোমার শেষ করে দেবো। [অগ্রসর]

শিকারিণী। [সম্মুখে গিয়া] না—ও ছুরি আমাকে দাও। [জয়ন্তের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া] ছোটবৌ! যে চোখে তুই বিষ দেখছিস, সে চোখে আর মধুর দৃশ্য দেখতে পারবি না, তবু জোড়হাত করে তোর কাছে মিনতি করছি—আমি তোর বড়, দিদির মত, পছন্দ করে আমিই তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম, তুই মিথ্যা কলঙ্ক রচনা করে আমার মাথায় আকাশ চাপিয়ে দিস না, ভুলের মালা গলায় পরে আমার ভাইয়ের মত জয়ন্তকে নরকে ঠেলে দিস না—নিজের হাতে কুড়ুল মেরে নিজের মাথা ভাঙিস না।

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। যাও—যাও, উপদেশে কাজ নেই। [জয়ন্তকে] কি গো, তোমার সতী-শিরোমণি বৌদি যে বলেছিল তোমার সঙ্গে কথা বলবে না?

জয়ন্ত। এখনও বলেনি।

মঞ্জুরী। না—কথা বলেনি, কেবল—

জয়ন্ত। চুপ কর শয়তানী! যা ভাবতে হয়, নিজের ঘরে গিয়ে ভাববে।

মঞ্জুরী। কেন, এ ঘর কি আমার নয়?

জয়ন্ত। না! এ আমার মায়ের মন্দির, এ মন্দিরে দেবীর অধিকার; তোমার মত আঁস্তাকুড়ের দাসীর এ মন্দিরে কোন অধিকার নেই।

মঞ্জুরী। কি—আমি দাসী!

জয়ন্ত। শুধু দাসী নয়—ক্রীতদাসী।

মঞ্জুরী। স্বামী!

জয়ন্ত। চুপ। তোমার স্বামী অনেকদিন আগে মরে গেছে, সামনে যাকে দেখছো সে রাজকুমার জয়ন্তপাল, তার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল, হাতের শাঁখা খুলে ফেল, আজ থেকে তুমি বি-ধ-বা।

[প্রস্থান।

মঞ্জুরী। রাজকন্যা মঞ্জুরী বিধবা! না-না-না, বিধবা সে নয়, সে কুমারী—রাজকুমারী মঞ্জুরী। সেই কুমারী মঞ্জুরীর আজ ফুলশয্যা। জয়ন্তপাল আমার স্বামী নয়, আমার স্বামী—মণ্ডলগাঁয়ের ছোট রাজকুমার। [এদিক ওদিক চাহিয়া] রাণা—

রাণার প্রবেশ।

রাণা। আদেশ করুন।

মঞ্জুরী। বেদেনী একা এসেছে?

রাণা। এসেছে।

মঞ্জুরী। কোথায় সে ?

রাণা। মন্দিরের আড়ালে।

মঞ্জুরী। যাও, তাকে নিয়ে এসো।

রাণা। যাচ্ছি বৌরাণী, কিন্তু—

মঞ্জুরী। কিন্তু কি ?

রাণা। ছোট রাজকুমার কই, তার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি।

মঞ্জুরী। কে বলছে আসোনি ?

রাণা। তিনি গেলেন কোথায় ?

মঞ্জুরী। তিনি অসুস্থ, আমাকেই সব দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

রাণা। তার কোন প্রমাণ—

মঞ্জুরী। রাণা ! আমি তার স্ত্রী, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি চাও ?

রাণা। আজ্ঞে সব স্ত্রী—স্ত্রী হয় না কিনা। তাই—

মঞ্জুরী। কি বললে ?

রাণা। আজ্ঞে সত্যি কথা। আপনারা বড়ঘরের বাসিন্দা, আপনাদের চেনা শক্ত; আমি জানি, বড়ঘরের স্ত্রীরা কেউ চায় স্বামী, কেউ চায় অর্থ—অলঙ্কার, আবার কেউ কেউ স্বামীকে ঠকিয়ে তার সম্পদও লুঠ করতে চায়।

মঞ্জুরী। আমাকে কি তাই ভেবেছো রাণা ?

রাণা। আজ্ঞে জেলের ছেলে, লেখাপড়া জানি না, চোখ থাকতে অন্ধ, কাজেই আলো কি অন্ধকার চিনবো কি করে ?

মঞ্জুরী। বেশ। [অঙ্গুরীয় খুলিয়া] এই নাও আমার বহুমূল্য হীরের আংটি, এই আমার প্রমাণ। [ছুঁড়িয়া দিল]

রাণা। [লুফিয়া লইয়া] হীরের আংটি ! জীবনে হীরে কখনও

চোখে দেখিনি, শুনেছি এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বিষ আর কিছুতে নেই।

মঞ্জুরী। হ্যাঁ, সংব্যবহারে অমৃত, অপব্যবহারে বিষ।

রাণা। থাক বৌরাণী, অমৃত ভেবেই আমি একাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি ভবিষ্যতে কোন বিষফল ফলে তার জন্য দায়ী এই বিষাক্ত হীরের আংটি।

[প্রস্থান।

মঞ্জুরী। ওঃ, ছোটলোক জেলের বাচ্চার মুখে বড় বড় কথা! কিন্তু এই গোপন ঘটনা যখন তার কানে উঠবে, যখন সে শুনবে তারই বে-নামীতে চিঠি দিয়ে বেদেনীকে আনিয়ে—না-না, এ আমি ভুল করছি। সে যখন এ ঘটনা শুনবে, তখন সে আর দূরে দূরে থাকবে না, কাছে আসবে একান্ত কাছে। সে শুধু যখন ভাববে—মঞ্জুরী ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু—আর কেউ নেই, স্বপ্নের বাসরে শুধু সে থাকবে আর আমি থাকবো।

একাবতীর প্রবেশ।

একাবতী। আর কেউ থাকবে না বহুরাণী।

মঞ্জুরী। তুমি—একা!

একাবতী। হ্যাঁ রে ছোকরী!

মঞ্জুরী। এত রূপ তোমার!

একাবতী। [খিল খিল হাসিয়া] ছোকরা হবার খোয়াব দেখছিস বহুরাণী?

মঞ্জুরী। তুমি বেদের মেয়ে—এ যে বিশ্বাস হয় না।

একাবতী। হয় না! অনেকের হয় না, অনেক লোক হাঁ করে

আমাকে দেখে—কত ছোকরার চোখে আগুন লাগে, কত ছোকরী গাগরীভরা পানী লিয়ে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়।

মঞ্জুরী। যাক, শোন একা! শুনেছি তুমি নাকি অনেক রোগের ওষুধ জানো?

একাবতী। কেনে না জানবে। আমার বাপুজী জানতো, মাতাজী জানতো, আমিও জানে।

মঞ্জুরী। তুমি কি কি রোগ ভাল করতে পারো?

একাবতী। হরেক কিসিম। সাপে কাটা, বিছায় খাওয়া—বাত-বেদনা, খাট্টা শূল—সব রোগের দাবাই আমার কাছে আছে বটে। তুই বুঝি দাবাই লিবি, তার লেগেই আমাকে ডেকেছিস?

মঞ্জুরী। আমি ডাকি না, ডেকেছে আমার—

একাবতী। রয়। তা বল কিসের দাবাই চাই? [এদিক ওদিক চাহিয়া] বাতের?

মঞ্জুরী। না।

একাবতী। বেদনার?

মঞ্জুরী। না।

একাবতী। শূল-যাতনার?

মঞ্জুরী। না-না।

একাবতী। তবে—[সম্মুখে আসিয়া চাপা কণ্ঠে] ছেলে হওয়ার লেগে—

মঞ্জুরী। বেদেনী!

একাবতী। [খিল খিল হাসিয়া] সাপের হাঁচি বেদেনী চিনে ছোকরী।

মঞ্জুরী। না। ভুল হয়েছে তোমার, আমি চাই—বশীকরণের ওষুধ।

একাবতী। বশীকরণ! তার লেগে দাবাই লিবি।

মঞ্জুরী। হ্যাঁ।

একাবতী। হ্যাঁ রে ছোকরী—কাকে বশ করবি বটে?

মঞ্জুরী। আমি করবো না, আমার স্বামী করবে।

একাবতী। বটে! তা যাকে বশ করবে, সে আদমী—না আউরৎ?

মঞ্জুরী। আদমী।

একাবতী। আচ্ছা দিবে তার দাবাই, তবে আজ লয়।

মঞ্জুরী। না, আজই চাই!

একাবতী। আজই চাই? জরুরী কাম—তবে লে, ধর—[বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পুরিয়া বাহির করিয়া দিল] আমি সাথে করে লিয়েই এসেছে।

মঞ্জুরী। আশ্চর্য্য!

একাবতী। শুধু দাবাই লয় ছোকরী—কত কি আছে আমার সাথে! আমি বেদে কি আওরৎ, সুরতীওয়ালী ছোকরী, আমার কদমে কদমে ভয়—তাই সবখন আমার কোমরে থাকে বিষেভরা কালনাগিনী। [কোমর হইতে কালনাগিনী বাহির করিল]

মঞ্জুরী। [সভয়ে পিছাইয়া] আঃ—কি ভয়ঙ্কর!

একাবতী। ভয় কি ছোকরী—তোকে কিছু বলবে না, দাবাইয়ের নেশায় আছে, দাঁতে এর জিয়াদা গরল—একবার ছুবলে দিলে আর সাড়া দিতে হবে না। হ্যাঁ—চলি বহুরাণী। দুশমণকে পানীর সাথে ও দাবাই গুলে খাইয়ে দিস—একদম ঘুঘু ব'নে যাবে; তবে হুঁশিয়ার—এই কালনাগিনীর বিষের চাইতে ও দাবাই জিয়াদা বিষাক্ত—বুঝে সমঝে খাওয়াস। আদমী দুশমণ বেয়াড়া বদমাস হলে

বশ মানবে, লেকিন ভাল আদমীকে খাওয়ালে আলবৎ সে পাগল হয়ে যাবে। [প্রস্থান ।

মঞ্জুরী। পাগল হয়ে যাবে! না-না, সে পাগল হবে কেন? সে তো ভাল নয়—সে শত্রু, সে বেয়াড়া বদমাস—আমার দিকে ফিরেও চায় না; এত রূপ—এত যৌবন তার কাছে কিছুই নয়। না-না, কোন চিন্তা নেই, এ বশীকরণের ওষুধ তাকে খেতেই হবে। রূপ দিয়ে—দেহ দিয়ে—মন দিয়ে যাকে কাছে পাইনি, এ বিষ দিয়ে তাকে পেতেই হবে।

দ্রুত জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। কারা গেল! চুপি চুপি কারা এ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল?

মঞ্জুরী। কই—কেউ তো এখানে আসেনি, তুমি তাহলে ভুল দেখেছো।

জয়ন্ত। ভুল দেখেছি!

মঞ্জুরী। তা না দেখবে কেন? মণ্ডলগাঁয়ের ছোট রাজকুমার তুমি, তোমার চোখে রামধনুকের সাতটা রংয়ের ঝিলিমিলি—তুমি দেখবে ভুল, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। আশ্চর্য্য! অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কারা বেরিয়ে গেল—ধরেও আমি ধরতে পারলাম না।

নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। আমিও পারলাম না জয়ন্ত। মন্দির থেকে নেমে

আসছি, হঠাৎ দেখি দুটো ছায়ামূর্ত্তি চুপি চুপি গুপ্তপথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, দেখেও আমি চিনতে পারলাম না।

অগ্রে ফকিরবেশী নসরৎ ও পশ্চাতে সামন্তপালের প্রবেশ।

সামন্ত। আমি কিন্তু চিনতে পেরেছি পিতা।

নরপাল। }
জয়ন্ত। } কে ও?

সামন্ত। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। গুপ্তপথের সামনে চুপচাপ বসেছিল, আমি একে ধরে এনেছি।

নরপাল। তুমি গুপ্তচর?

নসরৎ। জী না হুজুর, আমি মুশাফির।

জয়ন্ত। মুশাফির তো প্রাসাদে প্রবেশ করলে কি করে?

নসরৎ। লুকিয়ে। দ্বাররক্ষী গাঁজা টেনে ঢুলছিল, রাত তখন অনেক—সেই ফাঁকে লুকিয়ে আমি ঢুকে পড়েছি।

নরপাল। তোমার সঙ্গের সেই মেয়েটি গেল কোথায়?

নসরৎ। মেয়ে কোথায় পাবো হুজুর!

নরপাল। সত্যি কথা বল।

নসরৎ। খোদার কসম—মেয়েমানুষ আমার সঙ্গে ছিল না।

জয়ন্ত। তোমার বাড়ী কোথায়?

নসরৎ। যেদিন যেখানে থাকি।

সামন্ত। তোমার নাম?

নসরৎ। যে যা বলে ডাকে।

সামন্ত। শুনছেন পিতা, হেঁয়ালীভরা কথাগুলো শুনছেন। তুমি নিশ্চয় হোসেন খাঁর গুপ্তচর!

নসরৎ। হোসেন খাঁ আবার কে? ও—বুঝেছি, কলিমদ্দিনের নানার কথা বলছেন? তা হুজুর সেই তো একবেলা উপোস করে, সে গুপ্তচর রাখবে কেন?

সামন্ত। হোসেন কাজী, তিনের পরগণার তালুকদার—সাতের পরগণার তালুকদার হাসান খাঁর ভাই, আমি তার কথা বলছি—

নসরৎ। তা হুজুর বলতে পারেন! হাসান খাঁ যেমন কাজী, আপনিও তেমনি পাজী। নইলে আমার পিঠে চাবুক মারেন!

সামন্ত। বেশ করেছি মেরেছি, আবার মারবো। [চাবুক মারিল]

নসরৎ। উঃ! হুজুর, দেবতার সামনে বাঁদরে বাঁদরামী করবে?

সামন্ত। তবে রে শূয়ার—

নরপাল। থামো সামন্ত। বেচারা সত্যই মুশাফির, ওকে ছেড়ে দাও।

সামন্ত। আপনি জানেন না—

জয়ন্ত। পিতার কথার উপর কথা বলো না দাদা।

নসরৎ। আপনি বুঝি বড় হুজুরের ভাই?

জয়ন্ত। হ্যাঁ পথিক। যাও তুমি, সামনে দ্বাররক্ষী আছে ওকে আমার নাম করে বললেই তোমাকে প্রাসাদের বাইরে করে দেবে। কিছু মনে করো না ভাই, দাদার ব্যবহারে পিতা দুঃখিত, আমিও—

সামন্ত। ব্যথিত। সে তো হতেই হবে। তোমার বন্ধুর গুপ্তচর কিনা, বেশীক্ষণ রাখলে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

নরপাল। সামন্ত! তোমার সাহস দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

সামন্ত। তার জন্য দায়ী আপনি।

নরপাল। আমি?

সামন্ত। নয় তো কে? যত স্নেহ-মমতা-কোমলতা আপনার জয়ন্তের উপর। কেন, আমি কি এ বাড়ীর কেউ নই? একটা কথাও আমার বলবার অধিকার নেই?

নরপাল। কি করে থাকবে পুত্র। হৃদয় যার বিষে ভরা— সে সব কিছুই বিষময় দেখে। নিজের উপর বিশ্বাস নেই তোমার, ভাইয়ের উপর স্নেহ নেই—পিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই, যে প্রজারা আমার বুকের এক একটা হার—তাদের প্রতিও তোমার একবিন্দু দরদ নেই। তুমি কি মানুষ?

নসরৎ। মানুষ—তবে মুখোসে ঢাকা।

সামন্ত। কি বললি শয়তান?

নসরৎ। শয়তান আমি নয়—তুমি, তোমার অত্যাচারে মেয়েরা পথে বেরোয় না।

সামন্ত। যবন!

নসরৎ। আমি তো যবন, তুমি কি? পিতাকে পথে বসিয়ে আমারই মত এক যবনকে ডেকে আনবার মতলব ভাঁজছো— রাজ্যের সুন্দরী মেয়েগুলোকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পদ্মদীঘির বুকে বজরা ভাসায় কে?

নরপাল। মুশাফির!

সামন্ত। ওর কথা সম্পূর্ণ—

নসরৎ। মিথ্যা—কেমন? দেখুন তো ছোট হুজুর, এ চিঠি কে কাকে লিখেছে?

জয়ন্ত। [পত্র লইয়া] এ কি!

নরপাল। কি হলো জয়ন্ত?

জয়ন্ত। এ চিঠি কাজী হাসান খাঁকে লিখেছে—

নরপাল। কে—কে সে বর্ব্বর, কার বুকের এমন পাটা?

সামন্ত। আমার।

নরপাল। সামন্ত!

সামন্ত। আপনি যা ভেবেছেন তা আমি হতে দেবো না পিতা, মণ্ডলগাঁয়ের সিংহাসন আমার চাই।

নরপাল। জয়ন্ত! বন্দী কর দেশদ্রোহী শয়তানকে।

সামন্ত। সাবধান জয়ন্ত! এক পা বাড়ালে রক্ষা নেই, থাকো ওইখানে দাঁড়িয়ে। আজ আমি চললাম, কিন্তু মনে রাখবেন রাজা নরপাল—যে অহঙ্কারে আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন, সেই অধিকারের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ মণ্ডলগাঁয়ের রাজ-সিংহাসন আমার চাই—তবে আজ নয়, দু'দিন পরে। [প্রস্থান।

নরপাল। কে আছিস, তোরণদ্বার বন্ধ কর, দেশদ্রোহীকে বন্দী কর।

নসরৎ। না হুজুর, না। গেছে যাক, ওর যাওয়াই ভাল। মনে করুন একটা হাতে ক্ষত হয়েছিল—সে হাতটা আপনি কেটে ফেলেছেন।

নরপাল। মুশাফির!

নসরৎ। জী হাঁ হুজুর। যে অঙ্গ পচে গেছে, তাকে বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

নরপাল। মুশাফির! তুমি সত্য বল তোমার পরিচয় কি?

নসরৎ। আমার কোন পরিচয় নেই হুজুর, ছিল আমার বাপের—তার নামে তামাম বাংলায় আজও গান শোনা যায়, তার কত কীর্ত্তিস্তম্ভ বাংলার পথে-প্রান্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তার অযোগ্য সন্তান—আমার কোন বড় পরিচয় নেই।

জয়ন্ত। তোমার কি কাজ ভাই ?

নসরৎ। অনেক কাজ ভাইজান—অনেক কাজ! কাজের চাপে চোখে আমার ঘুম নেই—কাজের চাপে দীলে আমার শান্তি নেই। খেতে বসে খাই না, পালঙ্কে আমি শুই না। আমি শুধু ভাবি—কি ভাবি জানো ? আমি ভাবি আমি অপদার্থ, আমি অলস—বিলাসী—স্বার্থপর। তাই আমি কি করি জানো ? আমি করি আর্ত্তের সেবা, ধর্ম্মের রক্ষা, পাপীকে শাস্তিদান। আমি মুসলমান হয়ে খোদার নমাজ পড়ি, হিন্দু হয়ে ভগবানকে ডাকি। আমি নিজের খাদ্য পরের মুখে তুলে দিয়ে, বাংলার অবহেলিত লাঞ্ছিত উপেক্ষিত সাত কোটি হিন্দু-মুসমানের মিলনমালা রচনা করে দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান করি। ওরে নমাজী, ওরে পূজারী, ওরে মুচি-মেথর-চাষী, ওরে আমার মাটির আত্মার সন্তান হিন্দু-মুসলমান! তোরা আয়—তোদের দুয়ারে খোদা-নারায়ণ কাঁদে—তাকে দেখবি আয়, তাকে চিনবি আয়, তার চোখের পানী দু'হাত দিয়ে মুছিয়ে দিবি আয়।

[প্রস্থান।

নরপাল। জয়ন্ত! আমি চললাম, তুমি লোকটার পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত কর।

জয়ন্ত। আমার মনে হয় লোকটা সত্যই গুপ্তচর।

নরপাল। না।

জয়ন্ত। পাগল ?

নরপাল। না।

জয়ন্ত। কিন্তু নিঃসন্দেহে মুসলমান।

নরপাল। তাও না।

জয়ন্ত। তবে কি পিতা ?

নরপাল। লোকটা মানুষ।

জয়ন্ত। পিতা!

নরপাল। এই অমানুষের দুনিয়ায় কোথা থেকে এলো এতবড় একটা মানুষ। কি নাম কোথা বাড়ী, কোথায় গেল, আর এসেছিলই বা কোথা থেকে—সব জেনে তুমি অবিলম্বে আমাকে সংবাদ দেবে।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। লোকটা আমাকে পাগল করে দিয়ে গেল। কি উদাত্ত আহ্বান—"ওরে নমাজী, ওরে পূজারী, ওরে মুচি-মেথর-চাষী, ওরে আমার মাটির আত্মার সন্তান হিন্দু-মুসলমান—তোরা আয়, তোদের দুয়ারে খোদা-নারায়ণ কাঁদে, তাকে দেখবি আয় তাকে চিনবি আয়। তার চোখের পানী দু'হাত দিয়ে মুছিয়ে দিবি আয়।" স্বপ্ন, ভোজ-বাজী, উন্মাদনা, বিশ্ব-প্রেমের দুরন্ত আহ্বান—না-না, গলা শুকিয়ে গেছে, দেহ শিউরে উঠেছে। কে আছো, জল—জল, একপাত্র জল দাও—

জলপাত্র হস্তে দ্রুত মঞ্জুরীর পুনঃ প্রবেশ।

মঞ্জুরী। জল এনেছি স্বামী।

জয়ন্ত। দাও।

মঞ্জুরী। দাঁড়াও—তুমি উত্তেজিত, একটু অপেক্ষা কর। ততক্ষণ কবিরাজের এই ওষুধটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিই। [জলপাত্রে ঔষধ মিশাইল]

জয়ন্ত। কিসের ওষুধ?

মঞ্জুরী। ঘুমের। কতদিন তুমি ঘুমোওনি, খেয়ে নাও—ঘুম আসবে।

জয়ন্ত। তাই দাও। ঘুম আমার আসে না, আজ আমি ঘুমোবো। [জল পান করিয়া] একি! এত তিতো কেন?

মঞ্জুরী। ওষুধ তিতোই হয়।

জয়ন্ত। কিন্তু মাথাটা জ্বালা করছে যে!

মঞ্জুরী। ও কিছু নয়।

জয়ন্ত। না-না, মাথা ঘুরছে—চোখের সামনে কি যেন—সাপ! মঞ্জু—মঞ্জুরী! এত সাপ আমাকে তেড়ে আসছে কেন? না—না, সাপ নয়—সেই মহতী আহ্বানের রক্তাক্ত অক্ষর—সেই শব্দ, সেই আহ্বান—"ওরে আয়, তোদের দুয়ারে খোদা-নারায়ণ কাঁদছে, তাকে চিনবি আয়—তাকে দেখবি আয়, তার চোখের পানী দু'হাত দিয়ে মুছিয়ে দিবি আয়।"

[প্রস্থান।

মঞ্জুরী। আসছে, এইবার ঘুম আসছে—বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে যাবে। বয়ে যাবে কালরাত্রির বিষাক্ত প্রহর, জীবন-আকাশে হেসে উঠবে নতুন সূর্য্যের দ্যুতি, চোখ মেলে দেখবে রাজার কুমার—সামনে তার বাসন্তীপ্রতিমা রাজকুমারী মঞ্জুরী। সেখানে আর কেউ নেই—শুধু সে আর আমি, বর আর বধূ—হাঃ-হাঃ-হাঃ! আছে আর একটা জিনিস—চাওয়া আর পাওয়া।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মামুদ মঞ্জিল।

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। যা চেয়েছিলাম তা পেলাম না, যা পেলাম তা কোনদিন চাইনি। এমনি হয়—মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। আমি কি কোনদিন খোয়াব দেখেছিলাম, ভাইজানকে—মামুদকে ছেড়ে পৃথক মহলে বাস করতে হবে, আমি কি ভেবেছিলাম—জন্মভূমির মাটি এমনি করে ভাগ হয়ে যাবে, আমি কি চিন্তা করেছিলাম সাঝেঁ-সবেরে সকলে এসে আমাকে বলবে—

মৌলভীবেশী নসরৎ শাহের প্রবেশ।

নসরৎ। সেলাম জনাব।

হোসেন। কে! আপনি?

নসরৎ। জী, আমি। মৌলানা আবদুর রমজান।

হোসেন। এখানে কিসের প্রয়োজন?

নসরৎ। জনাবের কাছে আমার আর্জ্জি আছে।

গহরজানের প্রবেশ।

গহর। আর্জ্জি পেশ কর। জলদী জলদী আর্জ্জি পেশ করে হোসেনকে ছেড়ে দাও। সবের থেকে কত প্রজা দেউড়ীতে অপেক্ষা করছে; হোসেন তাদের সঙ্গে মোলাকাত করবে—তাদের আর্জ্জি শুনবে—নালিশ শুনবে।

নসরৎ। তুমি কে বৃদ্ধ?

হোসেন। তুমি নয়—আপনি বলুন।

নসরৎ। আপনি কি সত্যই সবেরে কাফের হিন্দুগুলোর সঙ্গে মোলাকাত করবেন জনাব?

গহর। ইয়াসিন! মৌলভী সাহেবকে বার করে দাও।

হোসেন। না-না, থাক চাচাজান! হ্যাঁ, বলুন কি আপনার আর্জ্জি?

নসরৎ। আমি নসীবপুরের খানদানী বংশের ছেলে, আমার নাম আবদুর রমজান খাঁ, আমার বাপের নাম আবদুর তোরমান খাঁ, তার বাপের নাম আবদুর লেকজান খাঁ, তার বাপের নাম—

গহর। রাধেশ্যাম মণ্ডল।

নসরৎ। বৃদ্ধ!

গহর। না হয় রামচন্দর চৌধুরী এমনি কিছু হবে একটা। শুধু তুমি কেন, বাংলার বেশীর ভাগ খাঁটি মুসলমান তার তিন পুরুষের বেশী চার পুরুষের নাম বলতে গিয়ে হোঁচট খায়।

হোসেন। খাবেই তো! চার পুরুষ আগে তারাই ছিল খাঁটি হিন্দু। যাক, বলুন আপনার যা বলবার।

নসরৎ। আমার বাড়ীর দক্ষিণে আমার খানকা, ঠিক তার পশ্চিমে আমাদের মসজিদ—

গহর। তার পূর্ব্বের—

নসরৎ। জায়গাটা ফাঁকা ছিল, কিন্তু এক বে-আদব ব্রাহ্মণ সেখানে একটা মন্দির তুলছে।

হোসেন। তাতে কি হয়েছে?

নসরৎ। হয়েছে মানে, হবে—নমাজীদের নমাজ কাজা হবে।

হোসেন। কেন?

নসরৎ। নমাজের সময় কাফেরদের মন্দির থেকে পূজোর মন্ত্র শুনতে পাওয়া যাবে।

গহর। ভালই তো হবে।

নসরৎ। তাদের কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ—

হোসেন। নমাজের ক্ষতি করবে—কেমন? কিন্তু বলতে পারেন নমাজী, খোদাকে ডাকবার সময় যার মন থাকে বাইরের দিকে, যার কান থাকে সংসারের দিকে—সে কি নমাজ সত্যিকার পড়ে? তার নমাজ কি খোদার দরবারে কবুল হয়?

নসরৎ। অর্থাৎ—

হোসেন। ব্রাহ্মণ তার দেব-মন্দির সেখানেই তুলবে, আপনাদের অসুবিধা হয় মসজিদ সরিয়ে অন্য কোথাও বসাবেন।

নসরৎ। এ আপনার অত্যাচার জনাব।

হোসেন। জনাব একজনের উপর শাসনদণ্ড তুলে দিয়ে আর একজনের গায়ে সোহাগের হাত বোলাবে না মৌলভী সাহেব।

গহর। হিন্দুদের ভাই মনে করে পাশাপাশি বাস করতে পারো কর, না পারো সাতের পরগণায় উঠে যাও।

নসরৎ। জনাব কি তাই বলেন?

হোসেন। কেন, বৃদ্ধের কথা গ্রাহ্য হলো না? মৌলভী সাহেব! আমি শুধু নামমাত্র তালুকদার, আসলে মালেক আমার ওই বৃদ্ধ। আমার তালুকে জাতির বিচার চলবে না, ধর্ম্মের গোঁড়ামী মানবো না; সবাই আমার প্রজা, আমি মুসলমান জানবার আগে জানবে আমি বাঙালী। পদ্মা ভাগীরথী-বিধৌত শস্যশ্যামলা বাংলা মায়ের সন্তান-হিন্দু-মুসলমান, তারা পাশাপাশি বাস করবে, যে যার ধর্ম্ম পালন করবে। তাছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

নসরৎ। কিন্তু এসব হচ্ছে কি ?

গহর। কি সব মৌলভী ?

নসরৎ। হিন্দুরা সাতের পরগণা থেকে তিনের পরগণায় উঠে আসছে কেন ?

গহর। সাতের পরগণায় তোমাদের মাফিক খাঁটি মুসলমানদের মেহেরবানীর জ্বালায়।

নসরৎ। তারা জনাবের আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠবে।

হোসেন। তা উঠুক—অনেক দিন তারা পায়ের তলায় পড়েছিল।

নসরৎ। এখানকার হিন্দুরা খাজনা দিয়েছে ?

হোসেন। কোথেকে দেবে! দেখছেন না আশমানের তাওয়ায় খৈ ফুটছে।

নসরৎ। কিন্তু মুসলমানদের কাছ থেকে তো খাজনা আদায় করা হচ্ছে ?

গহর। হবেই তো, তাদের দেবার ক্ষমতা আছে।

হোসেন। ভগবান—হিন্দুদের সুদিন দিলে তারাও খাজনা দেবে। [ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম]

নসরৎ। তওবা—তওবা—কাফের হিন্দুদের ভগবানকে প্রণাম করছেন ?

হোসেন। ভগবান হিন্দুদের বাপের সম্পত্তি নয়।

নসরৎ। আমরা এসব সহ্য করবো না জনাব—এর উপযুক্ত বিহিত করবো।

গহর। তাই করবে মৌলভী, তোমাদের দ্বারা সুবিধা না হলে সাতের পরগণায় আমার ছেলে শুকুর খাঁ আছে—তাকে সঙ্গে নিও,

সেও খাঁটি মুসলমান। তোমরা ধরে আনতে বললে সে বেঁধে আনবে। আর দরকার হলে যুক্তি নিও আমার মেয়ে বেগম সাহেবা শোভানার কাছে—তোমরা তো কি খাঁটি, সে তোমাদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।

নসরৎ। চোপরাও বৃদ্ধ!

হোসেন। মৌলভী সাহেব—

নসরৎ। চোখ রাঙাবেন না তালুকদার। আপনার এই বে-আদবী আমরা সহ্য করবো না। অবিলম্বে নবাব নসরৎ শাহের দরবারে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবো।

হোসেন। তাই করবেন দোস্ত—তাই করবেন। যেদিন যাবেন পাণ্ডুয়া—আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন, সঙ্গে পাঠাবো আমার উজির বিজয় সেনকে।

গহর। সত্যি হোসেন?

হোসেন। হ্যাঁ সত্যি, আমি বাংলার নবাবের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো।

নসরৎ। নবাবের কাছে কৈফিয়ৎ!

হোসেন। নবাব বলে তিনি মাথা কিনে রাখেননি, তাঁকে আমি বুঝিয়ে দেবো—সুদূর পাণ্ডুয়ার বসে বাংলা শাসন করা যায় না। তিনি ভুলে গেছেন তার পুণ্যশ্লোক পিতা হুসেন শাহের কথা, বিচ্যুৎ হয়েছেন তার আদর্শ থেকে। কেন বাংলার আজ দুরবস্থা, কেন মুসলমানরা হিন্দুর বিরুদ্ধে ছুরি শানায়—এর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ তাঁকে দিতে হবে।

নসরৎ। মাথা থাকবে না তালুকদার।

গহর। না হয় কেটেই নেবে মাথাগুলো, তবু নবাবকে আমরা

দেখতে চাই—কেমন নবাব সে, কেমন তার নবাবী করা। হারেমে বসে আরাম করে নবাবী করা যায় না। প্রজাদের সুখ-দুঃখের খতিয়ান যার কাছে পৌঁছয় না, প্রজারা থাকলো কি গোল্লায় গেল, এ খোঁজ যে রাখে না—তার উচিত নবাবী ছেড়ে দিয়ে সড়কে নেমে আসা, তার জানা উচিত বাংলার নবাবী তক্ত খাঁটি মুসলমানের জন্য নয়—খাঁটি নবাবের জন্য।

নসরৎ। এই বৃদ্ধই আপনাকে ফকির করবে।

হোসেন। সেই ভাল মৌলভী সাহেব! আমি ফকির হয়ে মানুষ হবো, তবু—

শুকুর খাঁর প্রবেশ।

শুকুর। অ-মানুষ আমীর হয়ে কাজ নেই।

গহর। }
হোসেন। } শুকুর খাঁ!

শুকুর। আদাব তালুকদার হোসেন খাঁ!

হোসেন। আদাব—আদাব! তুমি সাতের পরগণা থেকে আসছো?

শুকুর। জী হাঁ।

হোসেন। কেমন আছেন আমার ভাইজান, বেগম সাহেবা কেমন আছে, মামুদ—

শুকুর। বহুতাচ্ছা।

হোসেন। ভাইজান তেমনি করে আগের মত হাসেন?

শুকুর। কেন হাসবে না!

হোসেন। হাসেন—কিন্তু মামুদ? মামুদ নিশ্চয় আমার নাম করে?

শুকুর। ভুলেও না।

হোসেন। করে না।

গহর। কেন করবে হোসেন? তুমি তাদের তালুক ভাগ করে নিয়েছো, তোমার তালুকে প্রজারা সুখে আছে—একি তাদের ভাল লাগে ভাবছো।

হোসেন। তা তো আমি ভাবিনি, আমি ভাবছি—

শুকুর। কেমন করে সাতের পরগণা দখল করা যায়।

হোসেন। শুকুর খাঁ!

শুকুর। একি মিথ্যা কথা?

গহর। আলবৎ মিথ্যা, হোসেন তোর মত বাঁদর নয়।

শুকুর। বাপজান!

গহর। হুঁসিয়ার জানোয়ার! আমি তোর বাপজান নয়, তোর বাপজান কবরে গেছে—ফিন আমাকে বাপজান বললে জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো।

নসরৎ। তওবা—তওবা, সিপাহশালার শুকুর খাঁর গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

শুকুর। তুমি থামো মৌলভী।

নসরৎ। আর মিঞা, বোনাইয়ের ভাতে মানুষ, প্রজারা তো দূর ছাই করে, নিজের বাপ—সেও কিনা বলে জুতিয়ে দেবো।

শুকুর। চোপরাও বাচাল।

হোসেন। চেঁচিও না শুকুর খাঁ, পাশের মন্দিরে পূজো হচ্ছে।

শুকুর। তাতে আমার কি যায় আসে। কাফেরদের আবার পূজো—

গহর। যবনদের আবার নমাজ—

শুকুর। হুঁ, ভগবান সস্তা। ছাঁচতলা নেই, গাছতলা নেই—একরাশ পাথরের নুড়ি—তার আবার ইজ্জত, তাই পূজো করে কাফেরগুলো হাজার হাজার আসরফি খরচ করে।

গহর। কাল থেকে তাদের বলে দেবো আশরফিগুলো তোকে দিতে।

শুকুর। কি বললে?

নসরৎ। তাদের আবার বদঅভ্যাস পাঁঠা বলিদান করে। তা—সিপাহশালারের স্বভাব খানিকটা সেই বিশেষ জন্তুটির মতই, সুতরাং আপনাকেই হাত পা বেঁধে দেবে তারা চুটিয়ে।

শুকুর। মর তবে কাফের!

হোসেন। খবরদার মিঞা! মনে রেখো, এটা আমার মুল্লুক, আর এখানে—

গহর। তোর চোখ রাঙানী কেউ পয়জার দিয়েও মানবে না।

নসরৎ। পায়ে ধরলেও না।

হোসেন। মৌলভী সাহেব! আপনি না খাঁটি মুসলমান?

নসরৎ। জী—শুকুর খাঁর মত এতখানি খাঁটি হতে পারিনি। হুজুরের চোখে একেবারে শিম্পাঞ্জীর দৃষ্টি—

শুকুর। আচ্ছা, এই বে-ইজ্জতির কথা আমার ইয়াদ থাকবে। শোন তালুকদার!

হোসেন। যো হুকুম সিপাহশালার।

শুকুর। যে সমস্ত কাফের হিন্দু আমাদের তালুক ছেড়ে তোমার তালুকে উঠে এসেছে, তাদের—

হোসেন। তাড়িয়ে দিতে হবে।

শুকুর। শুধু হিন্দুরাই নয়, মুসলমানরাও আসছে, তাদের আসা—

গহর। বন্ধ করতে হবে।

শুকুর। তারা উঠে আসার দরুন আমাদের যে বে-ইজ্জত হয়েছে তার দরুন—

হোসেন। আমার কিছু সংখ্যক হিন্দুপ্রজা তোমাদের তালুকে পাঠাতে হবে।

নসরৎ। বিশেষ করে যাদের ঘরে খুবসুরৎ ঔরৎ আছে।

শুকুর। এসব কি হচ্ছে হোসেন খাঁ?

হোসেন। বল তালুকদার!

শুকুর। তালুকদার হোসেন খাঁ—

হোসেন। যাকে আশ্রয় দেয়, জান থাকতে তাকে নিরাশ্রয় করে না। তোমার ভাই সাহেব আর আমার ভাবী সাহেবাকে বলবে, বাঙালীর দেশ এই বাংলা—সেই বাংলা থেকে বাঙালীকে উচ্ছেদ করে তাদের খুসির খোয়াব বরবাদ করে দিয়ে কখনও ভাল হবে না। আমার বদনসীব যে হতভাগ্য হিন্দুরা আমার তালুকেই আসছে, যে সোনার জন্মভূমি তারা ফেলে আসছে—যে সম্পদ দৌলত হারিয়ে আসছে, তার কিছুই আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না।

শুকুর। তাহলে তাদের দূর করে দাও।

হোসেন। দিতাম যদি তারা হিন্দু না হয়ে মুসলমান হতো।

নসরৎ। জনাবের এই হিন্দুপ্রীতি ভাল নয়।

হোসেন। তাদের উপর অত্যাচার করাই ভাল?

শুকুর। কি ভাল, কি মন্দ—তু'রোজ পরে বুঝবে তালুকদার। ভাই সাহেব আমাকে পাঠিয়েছিল আপোষে যদি ঝামেলার একটা ফয়সালা হয়। কিন্তু এখন দেখছি হিন্দুদের কোন দোষ নেই, তুমি

তাদের ডেকে আনছো। ঠিক আছে, ডাকো তাদের। আপোষে এ মিটবে না, মিটবে খুনোখুনির পর।

গহর। } শুকুর খাঁ!
হোসেন। }

শুকুর। মণ্ডলগাঁ এখন থাক, আগে দেখবো তোমাকে। তোমার সাহস আসমান ছাড়িয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, এক মাসের মধ্যে যদি তুমি উপযুক্ত খেসারৎ সহ কাফের হিন্দুগুলো সাতের পরগণায় ফিরিয়ে দাও উত্তম, আর তা যদি না দাও—তাহলে সিপাহশালার শুকুর খাঁ আজ তোমাকে জানিয়ে গেল সাতের পরগণার সঙ্গে তিনের পরগণার বীভৎস যুদ্ধের দাওয়াৎ। [প্রস্থান।

নসরৎ। কাজটা ভাল হলো না জনাব।

হোসেন। মন্দই হলো খাঁ সাহেব।

নসরৎ। তার চেয়ে হিন্দুগুলোকে পাঠিয়েই দিন না।

গহর। বেরিয়ে যাও বে-আদব। কোথাকার কে ডেকরা ছোঁড়া মৌলভী হয়ে কুট কুট করে ফোড়ন দিচ্ছে। বলি তুমি মানুষ, না ভেড়া? ভাত খাও, না ঘাস চিবোও? হিন্দুরা যদি এতবড় দুশমন, তাহলে তামাম মুসলমানদের নিয়ে আরবে চলে যাও—সেখানে তো একটা হিন্দু নেই। খাসা মরুভূমির বালি গিলবে আর নমাজ পড়বে; মরতে হিন্দুর দেশ এই হিন্দুস্থানে পড়ে আছো কেন?

হোসেন। আপনি থামুন চাচাজান! ওরা খাঁটি মুসলমান—খাঁটিই থাক। ওহে মৌলভী সাহেব! পারেন তো সাতের পরগণায় গিয়ে তালুকদার হাসান খাঁকে বলবেন, মেকী মুসলমান হোসেন খাঁ বললে—যে কটা হিন্দু এখনও তোমার তালুকে আছে, তাদেরও সে ডেকে নিয়ে যাবে।

নসরৎ। তাই বলবো জনাব! তবে হাসান খাঁকে নয়, বাংলার নবাবকে।

গহর। }
হোসেন। } নবাবকে!

নসরৎ। বলবো, নেমে এসো তুমি মসনদ থেকে, তোমাকে দেখাব এক আজব মানুষ; সে হিন্দু না মুসলমান তা জানি না, আমীর না ফকির তা বুঝি না, মন্দির তাকে ডাকে—মসজিদ তাকে টানে। পদ্মা ভাগীরথী-বিধৌত বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের খোয়াব তার জানে, হোসেন খাঁ তার নাম। সাঁঝ-সবেরে মাটির আত্মা বাংলাকে দেয় সেলাম—সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

হোসেন। মৌলভী সাহেব!

গহর। মৌলভী তার ভুল বুঝতে পেরেছে হোসেন। সবাই বুঝবে, বুঝবে না শুধু শুকুর খাঁ। কি করে বুঝবে? হারামীর বাচ্ছা যে—

হোসেন। চাচাজান!

গহর। আরে যা—যা, লড়াইয়ের দাওয়াৎ দিয়ে ভয় দেখাতে আসিস না। তুই হারামীর বাচ্ছা হলেও—আমি নই। আসিস তুই হাতিয়ার নিয়ে, বাংলার ভাত তোর চেয়ে আমি কম খাইনি, তোর চেয়ে কিছু কম তাকৎ আমার বুকে নেই। এলে আর তোকে ফিরে যেতে হবে না। যে শয়তানীভরা জান নিয়ে এখানে তুই আসবি—সেই জান শেষ করে এখানেই তোর কবর দেবো, তা যদি না পারি তাহলে আমার নাম গহরজানই নয়।

[প্রস্থান।

হোসেন। খোদা! দুনিয়ার মালিক, তবে কি আমার প্রেমের জয় হবে না! গীতা-চণ্ডী-উপনিষদের উপদেশ তবে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে! তবে কি আমি গলা টিপে ধরবো হিন্দু ভাইজানদের! না-না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মৌলভী-মৌলানা-হাফিজ এরা আমাকে কাফের বলে আমি তা গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যাকে আমি জানের চেয়েও পেয়ার করি সেই ভাইজান হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়াবে আমার সামনে? না-না, তা হতেই পারে না। আমি যাবো—আজ এখনি উল্কার মত ছুটে যাবো আমার জানের জান ভাইজানের কাছে। ভাইজান—ভাইজান—ভাইজান—

। দ্রুত প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

হাসান খাঁর গুলবাগ।

চঞ্চল হাসান খাঁর প্রবেশ।

হাসান। হোসেন! হোসেন! হোসেন! কই, কোথায় হোসেন! তবে কি আমি ভুল শুনলাম? না-না, তা কেমন করে হবে? আমি যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর—সে আমাকে ডাকছে ভাইজান—ভাইজান—

শোভানাবানুর প্রবেশ।

শোভানা। কি হলো কাজী সাহেব, হঠাৎ হারেম থেকে বাগিচায় ছুটে এলে কেন?

হাসান। শুনতে পাওনি শোভানা?

শোভানা। কি কাজী সাহেব?

হাসান। হোসেন আমাকে ডাকছে?

শোভানা। হোসেন তোমার কে?

হাসান। ভাই—ভাইজান।

শোভানা। শোভানাল্লা! এখনও বলছো হোসেন তোমার ভাই?

হাসান। তবে কি বলবো শোভানা?

শোভানা। দুষমন।

হাসান। শোভানা!

শোভানা। দুষমন না হলে মণ্ডলগাঁয়ের রাজকুমার জয়ন্তপালের সঙ্গে দোস্তি করে তোমার সাতের পরগণা কেড়ে নিতে আসে?

হাসান। বটে! এত সাহস তার? মেহেরবানী করে তালুকের ভাগ দিলাম—খাতির করে তাকে গ্রেপ্তার করলাম না। শুকুর খাঁ কই, তাকে ডাকো—বেঁধে আনুক আগে সেই কাফের জয়ন্তপালকে, তারপর আমি হোসেনকে দেখবো।

শুকুর খাঁ ও সামন্তপালের প্রবেশ।

সামন্ত। তালুকদার হাসান খাঁর জয় হোক।

হাসান। কে তুমি?

সামন্ত। আমি মণ্ডলগাঁয়ের—

শুকুর। যুবরাজ সামন্তপাল। শোভানা, তুই হারেমে যা।

হাসান। না-না, থাক। ওই হিন্দুর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় আমি একা পারবো না। তোমরা দু'জনে আমাকে সাহায্য করবে। হ্যাঁ বল হিন্দু, কেন এখানে এসেছো? কি তোমার মতলব—দুষমনী, না দোস্তি?

সামন্ত। দোস্তি।

হাসান। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাজা নরপাল অপমান করেছে বুঝি, কিংবা ছোটভাই এনকার?

সামন্ত। হ্যাঁ কাজী সাহেব।

হাসান। ধরেছি আমি ঠিক। আমি জানি—শুধু আমি কেন, সকলে জানে বিভীষণ না থাকলে রাবণ ধ্বংস হতো না। তা বল, কি করতে হবে আমাকে?

সামন্ত। সাহায্য।

হাসান। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পেয়েছি বেগম সাহেবা! পেয়েছি সিপাহশালার! মগুলগাঁ ধ্বংসের সড়ক খুঁজে পেয়েছি। বেইমানী নিমকহারামী শয়তানী না করলে এই হিন্দুস্থান হিন্দুদেরই থাকতো, এ দেশে পা বাড়াতে হতো না মহম্মদ ঘোরীকে। বিভীষণ শুধু লঙ্কায় ছিল না—সব দেশেই আছে। যাক, তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। তোমার পিতা তোমাকে ঘৃণা করে—সিংহাসন পাবার আশা নেই—আমাকে তা দখল করে দিতে হবে, এই তো?

সামন্ত। হ্যাঁ।

শোভানা। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা কি পাবো হিন্দু?

হাসান। বহুতাচ্ছা বেগম সাহেবা—এই তো বেগমের যোগ্য কথা। আমি তাহলে চলি, তোমরা দুই ভাই-বোনে মিলে সামন্তের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেল।

শোভানা। কাজী সাহেব!

হাসান। ভয় নেই শোভানা বেগম, এখনি আবার আসবো। এখনো দীলের ভেতরকার মানুষটা চোখ রাঙাচ্ছে—এখনো ইমানটা কাৎ হয়ে পড়েনি—এখনো আমার শিরায় বাঙালীর রক্ত বইছে,

আমি একটু আড়ালে গিয়ে তাদের গলা টিপে শেষ করে ফেলি, বাঙালীর রক্তটুকু বার করে দিয়ে—জানোয়ার অমানুষ শয়তানের রক্তপান করে বে-ইমান—বে-শরম হাবসী সেজে আসি।

[প্রস্থান।

শোভানা। শুনলে ভাইজান কথাগুলো ?

শুকুর। তুই একটু বাইরে যা। এ সময় রাগ না করে ভাই সাহেবকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আয়।

শোভানা। কেন, আমার সামনে কথা হবে না ?

শুকুর। তোর কি কোন আদব-শরম-ইজ্জত নেই শোভানা ?

শোভানা। থাকবে কি করে ? তোমার মত বে-আদব বে-শরম বে-ইজ্জত ভাইয়ের বহিন যে আমি।

[প্রস্থান।

সামন্ত। এই তোমার বোন ?

শুকুর। হ্যাঁ দোস্ত।

সামন্ত। শুনেছিলাম, রূপবতী বলে খ্যাতি আছে ?

শুকুর। আছেই তো, দেখলে না ?

সামন্ত। তোমার বোনের চেয়ে আমাদের দাসী অনেক সুন্দরী।

শুকুর। সামন্তপাল !

সামন্ত। যাক, তাহলে সেই সর্ত্তে তুমি রাজী ?

শুকুর। আলবৎ। তবে হুঁসিয়ার—কথার যেন খেলাপ না হয়।

সামন্ত। মোটেই না—নাগিনী একাকে তুমি পাবেই।

শুকুর। তা যদি পাই দোস্ত, তাহলে খোদার নামে কসম খেয়ে জবান দিচ্ছি—মণ্ডলগাঁয়ের সিংহাসন তোমাকে দখল করে দেবো।

[উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিল।]

সহসা শোভানাবাঈর পুনঃ প্রবেশ।

শোভানা। থামোস—

শুকুর। কি হলো?

শোভানা। কাজী সাহেব আসছেন।

শুকুর। তাহলে শুনে রাখ শোভানা, দোস্ত জবান দিয়েছে—সিংহাসন পাওয়ার পর দশ হাজার সৈন্য আমাদের দেবে। আমাদের বিশ হাজার, হাবসী সৈন্য পাঁচ হাজার, আর দশ হাজার মগুলগাঁ থেকে পেলেই—

হাসান খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

হাসান। এক ফুঁয়ে হোসেন খাঁকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কেমন?

সামন্ত। দরকার হলে আরও পাঁচ হাজার—

হাসান। সৈন্য দেবে। আলবৎ দেবে—না দিলে লঙ্কা ধ্বংস হবে কি করে! তবে হুঁসিয়ার হিন্দু, কথার খেলাপ হলে—

হিন্দু ভিক্ষুকবেশী নসরৎ শাহের প্রবেশ।

নসরৎ। মাথা থাকবে না।

শুকুর। }
হাসান। } কে তুই?

নসরৎ। আজ্ঞে আমি ভিখিরী, এক মুঠো ভিক্ষা পেলেই চলে যাই।

সামন্ত। তোকে—

নসরৎ। চেনা-চেনা লাগছে হুজুর। লাগবেই তো—আপনি যেমন শেয়াল—আমিও তেমনি পেচক। বনে জঙ্গলে প্রায় দেখা—

সামন্ত। এ কথার অর্থ ?

নসরৎ। হুজুর, সোজা কথাটা বুঝলেন না! আমি যেমন ভিখিরী, আপনিও তেমনি—

হাসান। না-না, ভিখিরী ও থাকবে না, আমি ওকে রাজা করে দেবো।

নসরৎ। আমাকেও একটা কিছু করে দিন না হুজুর!

শোভানা। তুই হিন্দু—না মুসলমান ?

নসরৎ। আজ্ঞে হিন্দু।

শোভানা। হিন্দু!

নসরৎ। হ্যাঁ মা-লক্ষ্মী।

শোভানা। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী কি কথা? তওবা—তওবা!

নসরৎ। রাম—রাম—

শোভানা। চোপরাও কাফের হিন্দু! [চাবুক মারিল]

নসরৎ। উঃ, ভিক্ষে তো পেলাম না, পেলাম চাবুক। হুজুর দেখে নিন, আপনার কপালেও চাবুক।

সামন্ত। ভিক্ষুক!

নসরৎ। আজ্ঞে, ছোট ভাই তো পাগল, বাপ-ব্যাটার গঙ্গার দিকে পা, সিংহাসন তো আপনারই বাঁধা। তবু—

সামন্ত। চুপ কর শূয়ার। ভিখিরীর মুখে এত কথা কেন? জানিস আমার পিতা কেমন লোক, আমি তাকে বুঝিয়ে দেবো—সামন্তপাল শক্তিহীন নয়।

নসরৎ। পরের কাছে ধার করেও শিং নাড়তে জানে।

সামন্ত। বটে! এতবড় কথা? পাই আগে সিংহাসন, হই আমি রাজা, তারপর যদি তোকে দেখতে পাই—তাহলে তোর

মাথাটা কেটে রাজপথে ঝুলিয়ে রেখে, তোরই রক্ত দিয়ে লিখে দেবো রাজা সামন্তপালের এই হলো বিচার। চলি কাজী সাহেব, চলি বেগম সাহেবা! শুকুর খাঁ—আজ রাত্রেই তাহলে—নমস্কার।

[প্রস্থান।

শোভানা। নমস্কার আবার কি কাজী সাহেব?

নসরৎ। আজ্ঞে সেলামের ভায়রা ভাই।

হাসান। ভিখিরী!

নসরৎ। আজ্ঞে চাবুক তো খেলাম, কিন্তু ভিক্ষে এখনও পেলাম না!

শুকুর। এই নে ভিক্ষে—[তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত]

নসরৎ। ওরে বাপ, কাজ নেই ভিক্ষেয়—চললাম মশাইরা, চাবুকের দাগটা পিঠেই থাকলো, যদি কোনদিন রাজা কি নবাব হতে পারি, তাহলে চাবুকের বদলে ফিরিয়ে দেবো একজোড়া পয়জার।

[প্রস্থান।

হাসান। কে আছিস, ভিখিরীকে—

[নেপথ্যে হোসেন হাঁকিল—"ভাইজান!"]

শোভানা। কে!

শুকুর। হোসেন।

হাসান। হোসেন! হোসেন আসছে?

শোভানা। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম—সবেরেই কাফের হিন্দু মুখপোড়া ভিখিরী, আবার দুষমন হোসেন।

শুকুর। আমি হারেমে যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

ব্যস্তভাবে হোসেন খাঁর প্রবেশ।

হোসেন। ভাইজান! ভাইজান! ভাইজান!

[তৃতীয় দৃশ্য।]

হাসান। হোসেন! হোসেন! হোসেন!

শোভানা। [দৃঢ়কণ্ঠে] থাক, আর না।

হাসান। শোভানা!

শোভানা। ভাই নয়—

শুকুর। দুষমন।

হোসেন। ভাইজান! আমি তোমার—

হাসান। হ্যাঁ-হ্যাঁ।

হোসেন। তাহলে শুকুর খাঁ যা বলে এসেছে তা সত্যি?

হাসান। শুকুর খাঁ!

শুকুর। জ্বী—খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন সেদিন—

হাসান। হ্যাঁ সব সত্যি। রাগ করে না হয় তালুকটা ভাগই করলাম, তুই তো না মানলেই পারতিস।

হোসেন। ভাইজান!

হাসান। বেশ মানলি না হয়, কিন্তু কতদিন গেছিস—একবার দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল না বেয়াকুব?

হোসেন। গোস্তাকি মাফ কর ভাইজান! [পদতলে বসিয়া] আমি তোমার ছোট ভাই, মূর্খ—অর্ব্বাচীন, আমাকে আবার তুমি বুকে টেনে নাও।

হাসান। সে তো নেবোই—বাপজান যে আমার হাতেই তোকে তুলে দিয়েছিলেন, তুই আমার জানের হোসেন ছোট ভাই।

শোভানা। তাই বড় ভাইয়ের মাথায় পয়জার মারতে চায়।

শুকুর। ভিক্ষুক আর কেউ নয়, হোসেনের গুপ্তচর।

শোভানা। সেদিন খনিস ফতিমাকে হাতে-নাতে ধরে না ফেললে জহর খাইয়ে তোমাকে কবরে পাঠাতো।

শুকুর। বেশ করে চাবুক মারতেই খনিস বললে। আমি কি করবো, ছোট কাজী পাঠিয়ে দিয়েছে, তার হুকুম।

হাসান। আমাকে জহর খাইয়ে দুনিয়া থেকে—না-না, তা হতে পারে না।

হোসেন। ভাইজান—

শোভানা। আবার জারিয়া জোবেদা বলছিল, কাজী সাহেবকে খুন করে ছোট কাজী আমাকে নিকা করতে চায়।

হোসেন। উঃ খোদা!

শোভানা। চোপরাও বে-শরম, আমি না তোমার আম্মাজানের মত।

হাসান। এত নীচ, এত ছোট আমার ভাই—না-না, ভাই নয় দুষমন।

হোসেন। চোপরাও ভাইজান! চেয়ে দেখ আমার চোখের দিকে, আছে কোন কুৎসিত কলঙ্ক? [অগ্রসর হইল]

হাসান। না-না, তা নেই।

হোসেন। চেয়ে দেখ মুখের পানে, আছে কোন পশুত্বের ছাপ

হাসান। না-না-না—

শোভানা। কাজী সাহেব!

হাসান। [শোভানার দিকে চাহিয়া] হ্যাঁ-হ্যাঁ হোসেন।

হোসেন। ভাইজান!

হাসান। [হোসেনের দিকে চাহিয়া] না—না বেগম সাহেবা তোমার কথাই ঠিক—হোসেন চরিত্রহীন লম্পট, সে আমার দুষমন

হোসেন। তাহলে—

শুকুর। যুদ্ধের ময়দানে দেখা হবে।

[তৃতীয় দৃশ্য।]

হাসান। যুদ্ধ! ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ—হাসান-হোসেনের যুদ্ধ—রক্তে-রক্তে সংগ্রাম। হ্যাঁ হোসেন—না-না শোভানা—হ্যাঁ-হ্যাঁ হোসেন, ভাইয়ে-ভাইয়ে হাসান আর হোসেনের, রক্তের সঙ্গে রক্তের, জানের সঙ্গে জানের যুদ্ধই হবে।

হোসেন। তাহলে যুদ্ধ হবে?

হাসান। হবে—তবে কারবালার মাঠে নয়, সাতের পরগণা আর তিনের পরগণার মাঝে।

[প্রস্থান।

হোসেন। ভাইজান! [প্রস্থানোদ্যত]

শুকুর। দাঁড়াও কাফের, তোমাকে গ্রেপ্তার করবো।

হোসেন। [তরবারি কোষমুক্ত করিয়া] হুঁসিয়ার জানোয়ার! হোসেন খাঁও আজ থেকে অমানুষ। তোমরা আমার জানটা ছিঁড়ে নিয়েছো, তোমরা আমার ইমানকে গলা টিপে মেরেছো, তোমরা আমার রক্তের প্রবাহে জহর ছড়িয়ে দিয়েছো, তাই আমি আমার জন্মভূমির জমিনে পা রেখে খোদার নামে শপথ করে বলে যাচ্ছি—আজ থেকে ভাইজান আমারও দুষমন। আমি আর জীবন্ত দেখতে চাই না, দেখতে চাই মউৎ—মউৎ—মউৎ।

[প্রস্থান।

শোভানা। সৈন্যদের সাজতে বলো।

শুকুর। বলবো।

শোভানা। বাবর শাকে সংবাদ দাও।

শুকুর। দেবো।

শোভানা। হাবসী জওয়ান মোতায়েন করো।

শুকুর। করবো।

শোভানা। তিনের পরগণা, মণ্ডলগাঁ—প্রয়োজন হলে তামাম বাংলা আমার চাই সিপাহশালার শুকুর খাঁ।

[প্রস্থান।

শুকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আর আমি চাই—আমার এই বুকে থাকবে বশরাই গোলাবকি মাফিক রোশনীওয়ালী নাগিনী কন্যা এ—কা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মনসার মন্দির প্রাঙ্গণ।

মাথায় রুক্ষ চুল, দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডল ভরা, চোখ লাল,
খালি পা, হাতে একটি ছোট লাঠি লইয়া
উন্মাদ জয়ন্তপালের দ্রুত প্রবেশ।

জয়ন্ত। নাগিনী—নাগিনী। কালনাগিনী ছুটে আসছে আমাকে ছোবল দিতে। চোখ দুটো তার জ্বলছে, মুখ দিয়ে গরল ঝরছে, হিস হিস গর্জ্জন করে ফণা তুলে তীরের বেগে ছুটে আসছে ভুজঙ্গিনী কালনাগিনী!

বিক্ষিপ্ত বসনা বোরুদ্যমানা মঞ্জুরীর প্রবেশ।

মঞ্জুরী। স্বামী।

[চতুর্থ দৃশ্য।]

জয়ন্ত। ওই এসে পড়েছে—ফণা তুলেছে, এইবার—এইবার দিলে আমায় ছোবল! না-না, আমি মরবো না, ওকে মারবো—এক লাঠিতে মেরে শেষ করে দেবো—[হাতের লাঠি দ্বারা মঞ্জুরীকে নাগিনীভ্রমে প্রহার করিতে উদ্যত হইল]

সহসা শিকারিণী আসিয়া জয়ন্তের সম্মুখে দাঁড়াইল।

শিকারিণী। জয়ন্ত!

জয়ন্ত। কে—কে তুমি? ও, এতক্ষণে তোমাকে চিনেছি। তুমি এসেছো আমাকে ঘুম পাড়াতে! না-না, ঘুম আমার আসবে না—ঘুম আমার আসে না।

শিকারিণী। কি করে আসবে ঘুম? দশদিন বিষের ঘোরে পড়েছিলে—যখন উঠলে তখন অন্য মানুষ। সে চেহারা—সেই মুখ সেই মাধুর্য্য কে যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

জয়ন্ত। দিয়েছেই তো। কে দিয়েছে জানো? কালনাগিনী, সেই কালনাগিনীকে তুমি চেনো? চেনো না, আমি চিনি। জানো, বেশ ছিলাম আমি—চারিদিকে ছিল আনন্দ—ফুল—সবুজের স্বপ্ন, কিন্তু কোথা থেকে সেই নাগিনী এসে আমার বুকে ছোবল দিলে—অমনি আমার সব ফুল ঝরে গেল, সব আনন্দ মরে গেল, সব সবুজ কালোয় ভরে গেল।

মঞ্জুরী। দিদি! কি করলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে? কি দিলে আমি হারানো সম্পদ ফিরে পাবো? [জয়ন্তকে] ওগো! সেই কালনাগিনী আমি—আমার অপরাধে তোমার জীবন অন্ধকারে ভরে গেছে, তুমি আমাকে শাস্তি দাও।

শিকারিণী। মঞ্জু!

মঞ্জরী। দিদি! তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, তাই এত ব্যথা আজ আমার মনে চেপে বসেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর—আমি তোমার ছোট বোন—যা বলেছি, না বুঝে বলেছি; যা করেছি, না জেনে করেছি। দেবী তুমি, সতী তুমি। অভাগিনীকে ক্ষমা কর দিদি! হতভাগিনীকে ক্ষমা কর।

জয়ন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কালনাগিনীর কালোচোখে জল—না-না, সরে যাও—ও জল নয় গরল—মৃত্যুর আহ্বান।

শিকারিণী। ঠাকুরপো—

জয়ন্ত। কে, কে আমাকে ডাকে? বৌদি—কই, কোথায় তুমি? মঞ্জরী, বৌদি এসেছে, দুয়ার খুলে দাও। বৌদি—হাঃ-হাঃ-হাঃ! জানো মঞ্জরী, একদিন পিতা আমাকে বৌদির হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন, বৌমা—তোমার কোন ছেলেপুলে নেই, জয়ন্তই আজ থেকে তোমার ছেলে। সেইদিন—সেইদিন প্রথম দেখলাম সেই কালনাগিনীকে।

মঞ্জরী। সেইদিন সেই নাগিনীর বুকে জমে উঠলো মিথ্যার বিষ, ভুলের গরল। দিদি, একথা সেদিন বলোনি কেন?

শিকারিণী। বলতে চেয়েছিলাম মঞ্জু, তুই শুনতে চাসনি। সেইদিন থেকে তোর মনে জ্বলে উঠলো সন্দেহের আগুন, তোর সন্দেহ দেখে আমার স্বামীও করলো সন্দেহ, তোর একটুখানি ভুলের জন্য সোনার সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মঞ্জু! ঠাকুরপো পাগল হলো, স্বামী দেশ ছাড়লো, বৃদ্ধ শ্বশুর—

নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। খুসির হাসিতে ভেঙে পড়লো। এত সুখ আমার—না হেসে থাকতে পারি?

[চতুর্থ দৃশ্য ।]

শিকারিণী। বাবা !

নরপাল। আমার বড় ছেলে বিদ্রোহী—ছোট ছেলে পাগল, লক্ষ্মী-প্রতিমা তুমি, তুমিও যেন কেমন দূরে চলে গেছো মা। কেন—কেন? আমার কি কোন অপরাধ ছিল? সংসারের যোগ-বিয়োগে আমার কি কোথাও ভুল হয়েছিল বৌমা?

শিকারিণী। ওকথা বলবেন না বাবা।

নরপাল। কেন বলবো না? তোমার শাশুড়ীর কথা শুনে তোমাকে এনেছিলাম মগধ থেকে, তোমার কথা শুনে ছোটবৌমাকে আনলাম ভাঙা ঘরে সুখের হাট বসাবো বলে, কিন্তু—

শিকারিণী। বেদেনী তো এখনো এলো না বাবা।

নরপাল। আসবে মা, রাণাকে পাঠিয়েছি, তাকে নিয়ে এখনি আসবে।

মঞ্জুরী। আসবে, বেদেনী একা আসবে? দিদি, আমি তার কাছে মুখ দেখাব কি করে? তাকে যে মিথ্যাকথা বলে তবে—

জয়ন্ত। বিষ ঢেলেছো নাগিনী। কে আছো, আমাকে বাঁচাও। জ্বলে গেল, হু-হু করে বুকটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল! [দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।]

নরপাল। ধর মা ধর, পড়ে পড়ে মাথাটা ওর চৌচির হয়ে গেছে। মায়ের কাছে এসেছি, বেদেনীও এখনি এসে পড়বে, দেখা যাক শেষ চেষ্টা করে। কই, রাণা তো এখনও ফিরলো না। রাণা—রাণা—

রাণার প্রবেশ।

রাণা। আমি এসেছি মহারাজ,আমি এসেছি! [হাঁফাইতে লাগিল।

মঞ্জুরী। রাণা! তুমি আমার ভাইয়ের মত, নিয়ে এস তুমি বেদেনীকে, শুনি সে কি বলে। যদি বলে এই পাপের জন্য প্রাণ দিতে হবে, আমি তাই দেবো—আমি তাই দেবো।

একাবতীর প্রবেশ। তাহার মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কাঁধে পোঁটলা, হাতে ডম্বরু বাজিতেছিল ও
কণ্ঠে কাহিনী শোনা যাইতেছিল।

একাবতী।— কাহিনী।

দিব তোরে রাঙ্গা জবা দিব তোরে পূজা।
বাজনা বাত্তি রক্ত দিব, দিব বলি অজা,
আয় মা মনসা দেবী আয়।

রাণা।
নরপাল।
মঞ্জুরী।
শিকারিণী।
} একা!

একাবতী।— পূর্ব্ব কাহিনী।

ছোকরা কান্দে ছোকরী কান্দে
কান্দে আহা পিতা।
তোর বাপুজী কান্দনে পরে
লাগে না মা ব্যথা?
আয় মা মনসা দেবী আয়।

[কাহিনী শেষ হইলে তাহার চোখে-মুখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার চলার ছন্দে যেন সুর বাজিতেছিল, হাতের সাপটিকে তীব্রস্বরে একাবতী বলিল]

একাবতী। আরে এ কালনাগিনী, ঘুম যা।

নরপাল। একা!

একাবতী। রাজা! এখন কুনো কথা চলবে না—তোরা সব এখান থেকে চলে যা।

নরপাল। সকলে?

একাবতী। না। এখানে থাকবে—ওই ছোকরী-বহুরাণী।

মঞ্জুরী। দিদি!

শিকারিণী। থাক মঞ্জু, যা বলবে শুনবি। আসুন বাবা! এস রাণা!

[রাণা ও নরপাল সহ প্রস্থান।

জয়ন্ত। [তড়িৎ গতিতে উঠিয়া] আমিও যাবো, আমি এখানে থাকবো না। ওই দেখ আকাশ থেকে টপটপ করে সাপ পড়ছে, মাটি ফুঁড়ে বিষের চাড়া গজাচ্ছে। ওই সাপগুলো আমাকে ছোবল দেবে—ওই বিষের চাড়াগুলো আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলবে। আমি পালাই—আমি পালাই—[প্রস্থানোদ্যত]

একাবতী। [জয়ন্তের হাত ধরিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে] কুথা যাবি রে ছোকরা?

জয়ন্ত। আমি—

একাবতী। বস ওই ঢিপির উপর—[জয়ন্ত ঢিপির উপর বসিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মঞ্জুরী। হাসছো কেন একা?

একাবতী। আরে ছোকরী, তোর তো বাচ্চা হোবে।

মঞ্জুরী। একা! [লজ্জায় মাথা নত করিল]

একাবতী। আরে পাগলী, শরম করছে বটে! ঠিক আছে—

আমি খুসি হয়েছে। তুই যে মিথ্যা কথা বলে দাবাই লিয়েছিলি, তার লেগে তোর উপর জিয়াদা গোঁসা করেছিল, লেকিন তোর বাচ্ছা হবে বলে তোর বিলকুল গুনাহ মাপ করলম। ডর কেনে, তোর বর এখোন ভালা হয়ে যাবে। ওই দেখ ঘুম যাচ্ছে—যা-যা, দাঁড়া ওই একদিকে।

[মঞ্জুরা একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল, জয়ন্ত টিপির উপরে আধ-শোওয়া অবস্থায় ছিল, তাহার চোখে তন্দ্রার ঘোর, একাবতী পিঠ থেকে পোঁটলা নামাইয়া, ধীরপদে জয়ন্তের দিকে অগ্রসর হইল। পরে পোঁটলা হইতে ঔষধ বাহির করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন জয়ন্তের নাকের সামনে ধরিলে, জয়ন্ত চিৎকার করিয়া উঠিল।]

জয়ন্ত। সাপ! সাপ! কালসাপ! কালনাগিনী!

একাবতী। [খিল খিল করিয়া হাসিয়া] হ্যাঁ রে ছোকরা, আমি কালনাগিনী। লে, যে বিষে তোর দীলে নেশা হয়েছে—যে বিষে তোর মগজ ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, তার উল্টা বিষ এই মনসার দাওয়াই খেয়ে লে।

জয়ন্ত। না—না, খাবো না আমি—

একাবতী। কেনে না খাবি? আলবৎ খেতে হবে।

জয়ন্ত। খবরদার নাগিনী! আমার সামনে এলে তোর ফণা মুচড়ে ভেঙে দেবো।

একাবতী। তাই দে রে ছোকরা, দেখি কেমন তোর হিম্মত!

জয়ন্ত। দেখ তবে কালনাগিনী! [জয়ন্ত উঠিয়া এক দৃষ্টিতে একাবতীর দিকে চাহিয়া বিকট হাসিয়া উঠিল]

[চতুর্থ দৃশ্য ।]

একাবতী। বল, আমি কে বটে ?

জয়ন্ত। তুই চিতি।

একাবতী। আর তুই ?

জয়ন্ত। আমি ডোমনা।

একাবতী। তুই ডোমনা—আমি চিতি !

জয়ন্ত। তুই আমি একসঙ্গে ডোমনা-চিতি।

[সহসা একাবতীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, একাবতী সেই
অবসরে হস্তস্থিত ঔষধটি জয়ন্তের মুখে ঢালিয়া দিলে
জয়ন্ত তাহাকে ছাড়িয়া চিৎকার করিয়া ঢিপির
উপর পতিত হইল, মঞ্জুরী ভয়ে জয়ন্তের
কাছে আসিবার জন্য পা বাড়াইলে
একাবতী তাহাকে বলিল]

একাবতী। দেখ ছোকরী, তোর লেগে আমার ইজ্জত চলে গেল। যাক ইজ্জত, আমি বেদেনী—ওই পোঁটলায় নিমের ডাল আছে, দে—

মঞ্জুরী। [পোঁটলা হইতে নিমের ডাল বাহির করিয়া] নাও।

একাবতী। যা, ছোকরার পাশে গিয়ে বস।

[নিমের ডাল হাতে লইয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে বিচিত্র সুরে কন্যা
একাবতী গান গাহিতে লাগিল, গানের মাঝে মাঝে
নিমের ডাল দিয়া জ্ঞানহীন জয়ন্তের সর্ব্বাঙ্গে
আঘাত করিতেছিল। সে গাহিতেছিল—]

একাবতী।— গীত।

(বেহুলার) হলদি কাপড় মোমের বাতি
জ্বলে সারা রাতি রে—
একা কন্যা জাগে সারা রাতি।

নাগর কথা কয় না, পাশটি ফিরে শোয় না,
দুরু দুরু কাঁপে কন্যার ছাতি রে—
কেউটে গোখরো ফিরে যা,
যা অজগর ঘরে যা,
ডোমনার পাশে ঘুমায় চিতি রে—
মা মনসার দোয়াতে,
শিব দেওতার দোয়াতে,
বেহুলা বাঁচাল মরা পতিরে,
একা কন্যা জাগে সারা রাতি রে।

[গানের সুরে জয়ন্তের পাশে মঞ্জুরী ঘুমাইয়া পড়িল, গান শেষ করিতে করিতে সাপ, পেঁটেলা নিমডাল লইয়া মিষ্টি হাসিতে হাসিতে একাবতী প্রস্থান করিল।]

মধুর হাস্যমুখে শিকারিণীর প্রবেশ।

শিকারিণী। [টিপির কাছে গিয়া দুইজনকে ঘুমাইতে দেখিয়া জোড় হাত করিয়া] মা মনসা! তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম। আমার ভাঙা সংসারে তুমি হাসির বান ডাকিয়েছো, দেবরকে নিরাময় করেছো। মণ্ডলগাঁয়ের মাটিতে আজ থেকে তোমার আসন প্রতিষ্ঠা হলো দেবী! সুন্দর তুমি, মঙ্গলময়ী তুমি, জগতের কল্যাণ করো মহিমাময়ী—মণ্ডলগাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জগৎ-গৌরী বলে তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দেবে।

জয়ন্ত। [সহসা ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল] বৌদি! তুমি?

শিকারিণী। হ্যাঁ ভাই—

জয়ন্ত। মঞ্জু! মঞ্জু! দেখ তোমার সামনে কে।

মঞ্জুরী। [ঘুম ভাঙিয়া] এঁ্যা। দিদি! তুমি কিন্তু—[সহসা জয়ন্তের দিকে চাহিয়া উল্লাসে শিকারিণীর বক্ষে মাথা রাখিয়া] দিদি! দিদি! তুমি মানবী নয়, তুমি দেবী।

শিকারিণী। ছিঃ মঞ্জু! আমি তোর দিদি, এছাড়া আর কিছু নয়। জয়ন্ত! দুজনে একসঙ্গে দেবী মনসাকে প্রণাম করে প্রাসাদে যাও—বাবা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। [মঞ্জু ও জয়ন্ত একসঙ্গে প্রণাম করিল]

শিকারিণী। বল—আস্তিকস্য মুনির্মাতা, ভগিনী বাসুকীস্তথা।
জরুৎকারু মুনির্পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥

মঞ্জুরী। }
জয়ন্ত। } আস্তিকস্য মুনির্মাতা, ভগিনী বাসুকীস্তথা।
জরুৎকারু মুনির্পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥

শিকারিণী। যাও ভাই, আমি যাচ্ছি।

জয়ন্ত। যাচ্ছি বৌদি। স্বর্গের দেবীকে তো প্রণাম করলাম, এখন আসল দেবী—মর্ত্তের দেবী—মাটির দেবী—তুমি যে বাকী।

[শিকারিণীকে উভয়ে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

শিকারিণী। আজকের মত আনন্দের দিন আমার জীবনে আসেনি। ধন্য তুমি বেদেনী একাবতী, ধন্য তোমার সাধনা। তোমার সাধনায় আজ সারা মগুলগাঁ আনন্দে ভেসে যাবে, কিন্তু—ওগো, কোথা আছো তুমি! ফিরে এস—ফিরে এস প্রভু, দেখে যাও—রাজপ্রাসাদে আজ আনন্দের মেলা বসেছে।

[কালো পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া জনৈক সৈনিক
পিছন হইতে শিকারিণীর উপর কালো কাপড়
ঢাকা দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া
ফেলিল।]

শিকারিণী। [অস্ফুট স্বরে চিৎকার করিয়া] কে আছো, বাঁচাও—

সৈনিক। [জোরে আকর্ষণ করিয়া] কেউ নেই বেদেনী! জঙ্গলের পাশে আছে দশবাহকী তাঞ্জাম, তাতে গিয়ে বসবে চল— তুমি বসলেই তাঞ্জাম নিয়ে একেবারে শুকুর খাঁর গুলবাগে।

[শিকারিণীকে লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুত রাণার প্রবেশ।

রাণা। কি হলো—মনসা মণ্ডপে হলো কি বৌরাণী? একি! কেউ তো নেই! সকলে প্রাসাদে চলে গেছে—তবে কিসের যেন একটা শব্দ শোনা গেল! কি ব্যাপার? বৌরাণী—

দ্রুত নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। বৌমা! বৌমা! এই যে রাণা, বড় বৌমা কোথায়?

রাণা। কেন, তিনি প্রাসাদে ফিরে যাননি?

নরপাল। না।

রাণা। সেকি! আমি তো আপনাদের সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

নরপাল। কি বলছো রাণা! জয়ন্ত আর ছোট বৌমা যে একটু আগে গেল—তারা বললে শিকারিণী মণ্ডপে আছে?

রাণা। না, নেই।

নরপাল। নেই! একাবতী কোথায়?

রাণা। সে তার ঘরে ফিরে গেছে।

নরপাল। ভাল করে দেখেছো, বৌমা কোথায় ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

রাণা। না মহারাজ।

নরপাল। তবে কি তাকে—না-না, অসম্ভব। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এ সময় কার বুকের এত পাটা যে—না-না, আমার যে কেমন মনে হচ্ছে, মনটা বড় কু গাইছে রাণা। এই অন্ধকারে কোথায় গেল বৌমা? বৌমা—

রাণা। বৌরাণী—

গীতকণ্ঠে কঙ্কালের প্রবেশ।

কঙ্কাল।—

গীত।

নিভিয়া গিয়াছে দীপ।
চন্দন টিকা দিয়াছে মুছিয়া পরায়েছে কালো টিপ।

রাণা। }
নরপাল। } কি বলছো তুমি!

কঙ্কাল।—

পূর্ব গীতাংশ।

ব্যাধের কবলে পড়েছে হরিণী,
রক্ত দিয়ে হায় ধরিতে পরিনি,
উল্কাবেগে যা রে ছুটে দু'পায়ে দলিয়া শব শিব।

নরপাল। কার এত সাহস, কার বুকের এমন পাটা, কি তার নাম?

কঙ্কাল। তা জানি না, তবে দেখলাম তাঞ্জামে করে দশজন বাহক তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নরপাল। কোন পথে—কোন পথে আগন্তুক?

কঙ্কাল। এই সোজা পথ ধরে।

[প্রস্থান।

রাণা। মহারাজ! উল্কার মত ছুটে চললাম, দেখি কেমন করে তারা বৌরাণীকে নিয়ে যায়। ওরে দস্যুর দল, ওরে পশুর দল, তোদের কারও রক্ষা নেই। শয়তানেরা যেমন রাজবাংশের পবিত্র সম্ভ্রমে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিয়েছে, আমিও তেমনি তোদের চলার পথে এঁকে দেবো রক্তের আলপনা।

[প্রস্থান।

নরপাল। প্রাসাদরক্ষীরা জাগো—স্বেচ্ছাসেবকরা ছোটো, রাজ্যের সম্ভ্রম আজ শত্রুর কবলে, যেমন করেই হোক তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কে আছিস, আমার কালো ঘোড়া উল্কাকে নিয়ে আয়, আমি ছুটে গিয়ে তাদের টুঁটি টিপে ধরে শাণিত অস্ত্র বুকে বসিয়ে, রাজপথে রচনা করবো মৃত্যুর বিভীষিকা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র—অদূরে রণ-দামামা বাজিতেছিল।

মুক্ত তরবারি হস্তে সামন্তপাল ও শুকুর খাঁর প্রবেশ।

সামন্ত। বিভীষিকা! তিনের পরগণায় আজ মৃত্যুর বিভীষিকা! শয়তান হোসেন সন্ধ্যার পূর্বেই যুদ্ধ বন্ধের নিশানা দিয়ে শিবিরে চলে গেছে।

শুকুর। তা থাক কমবক্ত হোসেন খাঁ, আমরা তাকে বিশ্রাম করতে দেবো না।

সামন্ত। কি করবে বন্ধু?

শুকুর। আমাদের কিছু সৈন্য ওদের শিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করাবো।

সামন্ত। কি বলছো খাঁ সাহেব!

শুকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সামন্তপাল, শুকুর খাঁ হাবসী—সে জানে হাসান খাঁর জয় হবে না, হোসেনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে শয়তান নরপালের সৈন্য।

সামন্ত। শুকুর খাঁ!

শুকুর। গায়ে লাগলো বুঝি দোস্ত? কিন্তু কেন তা লাগবে হিন্দু? রাজা নরপাল তোমাকে কুকুরের মত রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে না?

সামন্ত। উঃ, অপমান! শুকুর খাঁ, আমি কিছুতেই সে অপমান ভুলতে পারি না। পিতার ঘৃণা, ভাইয়ের উপেক্ষা, স্ত্রীর উপদেশ আমাকে আজ রাক্ষস সাজিয়েছে। না-না, কোন কথা আমি ভুলবো না—তাদের কাউকে আমি ক্ষমা করবো না, মণ্ডলগাঁয়ের সিংহাসন আমার চাই, তার জন্য আমাকে যে মূল্য দিতে হয় আমি তাই দেবো।

শুকুর। কিছুই দিতে হবে না দোস্ত, শুধু বেদেনী একাকে তুমি আমার হাতে তুলে দেবে।

সামন্ত। বেদেনী একা তোমার শিবিরে।

শুকুর। সামন্ত!

সামন্ত। গতকাল রাত্রে আমার বিশ্বস্ত সৈনিক সহদেব তাকে মণ্ডলগাঁ থেকে চুরি করে তোমার শিবিরে নিয়ে এসেছে।

শুকুর। শোভানাল্লা! এ কথা আগে বলতে হয়তো! দোস্ত, তাহলে এক কাজ করো, তিনের পরগণা জাহান্নমে যাক। তুমি শিবিরে ফিরে যাও—আমি কিছুক্ষণ পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

সামন্ত। তাহলে কাল এ যুদ্ধ হবে না?

শুকুর। না।

সামন্ত। কেন?

শুকুর। কেন কি? দেখতে পাচ্ছো না—হোসেন খাঁর পাঁচ হাজার সৈন্য রাতারাতি বিশ হাজার হয়ে গেল। হোসেনকে রক্ষা করতে তোমার পিতা নরপালই তো সৈন্য পাঠাচ্ছে। কাজেই—

সামন্ত। এ যুদ্ধে হাসান খাঁর জয় হবে না। তাহলে এক কাজ করো বন্ধু—

শুকুর। বল।

সামন্ত। মণ্ডলগাঁয়ের সৈন্যরা রাজ্য ছেড়ে এখানে চলে এসেছে, এই সুযোগে আমরা, যদি মণ্ডলগাঁ আক্রমণ করি, তাহলে—

শুকুর। এক ফুঁয়ে রাজা নরপাল উড়ে যাবে, আর—

সামন্ত। সহজেই রাজ্য দখল করে জয়ন্তকে করবো বন্দী।

শুকুর। বন্দী করেই তুমি হবে রাজা, রাজা হয়েই আমাকে দেবে বিশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য; আর আমার পাঁচ হাজার হাবসী সৈন্য নিয়ে দুজনে আক্রমণ করবো বাংলার নবাব নসরৎ শাহকে।

সামন্ত। শুকুর খাঁ!

শুকুর। আরে দোস্ত, আমি বাঙালী নই—হাবসী। কোন পথে গেলে কাজ হাসিল হবে তা আমার হাড়ে হাড়ে জানা। বেশী কিছু জানতে চেও না, শুধু আমার কথামত কাজ করো। তুমি আজই রাত্রে ছাউনি তুলে মণ্ডলগাঁয়ের সীমান্তে ছাউনি ফেল। হুঁসিয়ার, বেদেনী যেন সঙ্গে থাকে।

সামন্ত। নিশ্চয় থাকবে।

শুকুর। বহুতাচ্ছা দোস্ত, তোমার ঋণ কখনও ভুলবো না।

সামন্ত। ঠিক আছে বন্ধু, তোমার কথামতই কাজ আমি করবো। যখন সীমান্ত শিবিরে যাবে তখন দেখবে তোমার জন্য পাঁপড়ি মেলে বুকভরা খসবু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বশরাই গোলাপ একা।

[প্রস্থান।

শুকুর। একা! একা! বশরাই গোলাপ একা! সে কাল থেকে আমার—না-না, আগে কাফের হিন্দুর সাহায্যে এই তরবারি একে একে বিদ্ধ করবো—হোসেন খাঁ, হাসান খাঁ, নবাব নসরৎ শাহের বুকে—সব শেষে পালা পড়বে বে-আদব বে-তমিজ

বে-হুদা কাফের সামন্তপালের। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তারপরে বাংলার তখত-ই-তাউসে নবাব হয়ে বসে পয়জার সমেত পা নাচাবে—

সশস্ত্র গহরজানের প্রবেশ।

গহর। নবাব শুকুর খাঁ।

শুকুর। কে!

গহর। নবাবের বাপ—গহর রাখাল।

শুকুর। তুমি!

গহর। হঁ্যা রে শুকুর। এতদিনে তোকে ব্যাটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে!

শুকুর। বাপজান!

গহর। ওরে বেওকুব, তোরা দুই ভাই-বহিন কেউ আমার অভিনয় বুঝতে পারিসনি।

শুকুর। কি বলছো তুমি?

গহর। শোন—শোন, কান দিয়ে শোন শুকুর! আমি চাই—বাংলার মসনদে বসবে আমার ব্যাটা শুকুর খাঁ।

শুকুর। বাপজান!

গহর। সিদি বদরকে খুন করে কাফের হোসেন শাহ বাংলার মসনদ হাবসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, এক রাত্রে বিশ হাজার হাবসীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আমি তার প্রতিশোধ চাই—আমি চাই হোসেন শাহের ব্যাটা নসরৎকে খুন করে আবার হাবসী বসুক বাংলার নবাবী তখতে।

শুকুর। সত্যি বলছো বাপজান?

গহর। তুই আমার ব্যাটা, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি

শুকুর—শুধু হোসেনকে শায়েস্তা করবার জন্যই আমার এত অভিনয়। জানিস, তালুক ভাগ করে হোসেনের কত দৌলত আমি আত্মসাৎ করেছি ?

শুকুর। তুমি আমায় মাফ করো বাপজান, আমি না জেনে তোমার কাছে কত বেয়াদবী করেছি।

গহর। বেশ করেছিল শুকুর—আমি সেসব কিছুই ধরিনি। আচ্ছা, আজ এখন তোর মতলব কি বল দেখি বাপজান ?

শুকুর। মতলব! আজ রাত্রেই আমি মণ্ডলগাঁর সীমান্তে চলে যাবো।

গহর। এমনি এমনি যাবি, কিছু একটা করে যাবি না ?

শুকুর। তাহলে শোন বাপজান, আজ রাত্রে এখানে আসার উদ্দেশ্য হোসেনকে খুন করা।

গহর। সাবাস বেটা, সাবাস! এই তো চাই। তাহলে শোন, আমি এটা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলাম, তাই কিছু ব্যবস্থাও করে রেখেছি—এখন তাহলে সেগুলো কাজে লাগাই।

শুকুর। কি বাপজান!

গহর। দেখ না কি করি—[হাতের বাঁশী দেখাইয়া] এই বাঁশীতে ফুঁ দিলেই একদল সৈন্য হোসেনের মহলে হানা দেবে, হোসেন কোনদিকে পালাবার পথ না পেয়ে এইদিকেই ছুটে আসবে, যেই আসবে তুই অমনি কাজ হাসিল করবি—[বাঁশীতে ফুঁ দিল এবং অদূরে বহুকণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল]

শুকুর। ওকি বাপজান!

গহর। কাজ শুরু হয়ে গেল।

শুকুর। কিন্তু একদল সৈন্য যে এদিকেই ছুটে আসছে।

গহর। আসবেই তো।

শুকুর। কিন্তু এদিকে হোসেন কোথায়?

গহর। হোসেন না থাক, শুকুর খাঁ তো আছে।

শুকুর। বাপজান!

গহর। হুঁসিয়ার হাবসী—পালাবার চেষ্টা করিস না, আজ তোর শয়তানী খেলার শেষ রাত—[অস্ত্র বাহির করিল]

শুকুর। আমার নয় বৃদ্ধ, তোমার—[অস্ত্র বাহির করিল]

গহর। চোপরাও কমবক্ত! এক পা বাড়ালে আমিই তোকে খুন করবো—[হাঁকিল] ওরে, তোরা মশাল নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।

শুকুর। না-না, আসবার আগেই আমি পালিয়ে যাবো।

গহর। যাবি কি করে, সড়কে যে পাথর—[পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল]

শুকুর। পাথর কেটে সড়ক করে নেবো। শয়তান—

গহর। না-না, তা পারবি না হাবসীর বাচ্ছা! আমিও হাবসী, দু'হাতে পাথর ভেঙেছি, খালি হাতে শের মেরেছি—এখনও কিছু তাকৎ আছে আমার হাতে—[উভয়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শুকুর খাঁর অস্ত্র গহরের বক্ষ ভেদ করিলে গহর আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল] আঃ—খোদা!

শুকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—খোদা! এতবড় শয়তান তুমি—চক্রান্ত করে—অভিনয় করে শুকুর খাঁর সকল খোয়াব বরবাদ করে দিতে চেয়েছিলে। মর—মর, বৃদ্ধ—[পুনঃ অস্ত্রাঘাত]

গহর। উঃ, ওরে তোরা ছুটে আয়, দুষমণ পালিয়ে যায়—দুষমণ পালিয়ে যায়—

শুকুর। পালিয়ে যায় নয়, পালিয়ে গেছে। তবে শোন বৃদ্ধ বেওকুব, তোমার মৃত্যুর আগে যদি হোসেন খাঁ এখানে আসে, তাহলে তাকে বলবে, শুকুর খাঁ বাঙালী নয়, হাবসী। সে শুধু শুকুর খাঁ নয়, তার নাম—শের-ই-জাহান-মির্জ্জা মহম্মদ শুকুরুদ্দিন মোবারক।

[দ্রুত প্রস্থান।

গহর। ওরে রাম-রহিম, মধু-করিম! তোরা শুকুরকে ধর, সে পালিয়ে যায়—সে পালিয়ে যায়—

সশস্ত্র হোসেন খাঁর প্রবেশ।

হোসেন। কই—কোথায় শুকুর খাঁ?

গহর। পালিয়ে গেছে হোসেন।

হোসেন। পালিয়ে গেছে! আপনি তাকে বাধা দিতে পারলেন না?

গহর। দিয়েছিলাম হোসেন, কিন্তু—

হোসেন। পুত্র বলে শেষ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন।

গহর। হোসেন!

হোসেন। আমার এ ধারণা কি মিথ্যা?

গহর। না-না, তা কখনও হতে পারে না। তালুকদার হোসেন খাঁ! তোমার ধারণা সত্য। মিথ্যা শুধু আমার এই কলিজার খুন।

হোসেন। [এতক্ষণে লক্ষ্য করিয়া] চাচাজান! একি—আপনি—[গহরজানকে ধরিল]

গহর। চোপরাও তালুকদার! [সরিয়া দাঁড়াইল] আমার গায়ে হাত দিও না। আমি মিথ্যাবাদী হাবসী, আমি শুকুর খাঁকে ছেড়ে দিয়েছি, আমার দেহ না-পাক, আমাকে ছুঁলে তোমার গুনাহ হবে।

হোসেন। ওরে কে আছিস, হেকিমকে তলব দে—

গহর। থাক হোসেন খাঁ। হেকিমের দাওয়াই এ মউৎমুর্দে জিন্দা করতে পারবে না। কলিজা আমার ফেটে গেছে, মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। শুকুর—শুকুর আমার ব্যাটার কাজ করেছে। খোদার কাছে আরজ করি—খোদা! দীন দুনিয়ার মালিক তুমি, আমায় যদি আবার দুনিয়ায় পাঠাও—তাহলে এই বেহেস্তী দেশ বাংলায় পাঠিও মেহেরবান—বাংলায় পাঠিও।

[প্রস্থান।

হোসেন। না-না, ওগো জিন্নতযাত্রী বৃদ্ধ! ওগো জাহানের দরদী সন্তান! বেওকুব হোসেনের গোস্তাকি তুমি মাফ করো। [নেপথ্যে হৈ-হল্লা ও আগুন—আগুন চিৎকার] ওকি, ভাইজানের শিবিরে আগুন লেগেছে, সৈন্যরা চিৎকার করছে। কে, কে করলে এ কাজ?

সশস্ত্র হাসান খাঁর প্রবেশ।

হাসান। তালুকদার হোসেন খাঁ।

হোসেন। ভাইজান!

হাসান। চোপরাও দুষমণ। ভাইজান বলে সোহাগ দেখাতে এসো না। তুমি আমার শিবিরে আগুন দিয়েছো, শ্বশুরকে খুন করেছো, তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না শয়তান।

হোসেন। বিশ্বাস কর ভাইজান, চাচাজানকে আমি খুন করিনি।

হাসান। কোন কথা নয়, মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

হোসেন। তুমি কি পাগল হলে ভাইজান?

হাসান। তবে কে দিয়েছে আমার শিবিরে আগুন।

মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। তার নাম আঃ—বাপজান, আমায় সাপে খেয়ে গেল। [পা ধরিয়া বসিয়া পড়িল]

হোসেন। } মামুদ।
হাসান। }

মামুদ। বেশ হয়েছে বাপজান! এত পাপ তোমার সইবে কেন? [লুটাইয়া পড়িল]

হোসেন। তুই এখানে কেন এলি মামুদ? [মামুদকে জড়াইয়া ধরিল]

মামুদ। এসেছিলাম একটা পয়গম নিয়ে—যা শুনলে বাপজানের অস্ত্র হাত থেকে খসে পড়তো, তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতো। তোমাদের এই মারামারি চিরদিনের জন্য থেমে যেতো।

হাসান। কি সে পয়গম?

মামুদ। শিবিরে আগুন দিয়েছে—দারুকে খুন করেছে মামা-সাহেব।

হাসান। শুকুর খাঁ—

মামুদ। আর তাকে পাবে না বাপজান, সে এতক্ষণ বহুদূরে—

হাসান। হোসেন! এ আমার কি হলো?

হোসেন। মামুদ—মামুদ! না-না, তোকে কিছুতেই মরতে দেবো না।

মামুদ। উপায় নেই চাচাজান, বাঁচাতে আমাকে পারবে না। উঃ—কি জ্বালা! হ্যাঁ বাপজান চাচাজান, আর খবর দিয়ে যাই শোন, মামাসাহেব মাকে অপমান করে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তোমার সমস্ত আসরফি আর সোনা নিয়ে গেছে।

হাসান। খোদা, দুনিয়ার মালিক!

মামুদ। খোদাকে পরে ডাকবে বাপজান, এখন যদি পারো শুকুর খাঁকে শাস্তি দিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেল বাপজান। আমি চললাম, আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে, হাত-পা সব অসাড় হয়ে আসছে। তোমরা আমাকে বিদায় দাও বাপজান।

[প্রস্থান।

হোসেন। ওরে মামুদ! মামুদ! কোথায় চলেছিস হতভাগা?

হাসান। ওকে যেতে দাও হোসেন। যে পথে ও পা দিয়েছে, তার চেয়ে ভাল পথ দুনিয়ায় আর নেই। চল—চল হোসেন, দু'ভাই মিলে কাজী বংশের একমাত্র সন্তান আমার মামুদের কবর দেবে এস।

হোসেন। ভাইজান!

হাসান। ওই দেখ—ওই দেখ হোসেন, বৃদ্ধ শ্বশুর যেন আসমানের কোণ থেকে চিৎকার করে বলছে, শয়তান হাসান খাঁ, আমার দাদুভাই কোথায়? ওই দেখ বাতাসের তরঙ্গে যেন মামুদ কেঁদে কেঁদে বলছে, বাপজান! তোমার ঠিক শাস্তি হয়েছে। ওরে হোসেন, অভিমানী পুত্র আমায় ফেলে চিরদিনের মত চলে গেল। [প্রস্থান।

হোসেন। না-না-না, মামুদকে আমি মরতে দেবো না, আমার জানের বিনিময়েও আমি তাকে বাঁচাবো। ভাইজান, মামুদকে নিয়ে তুমি প্রাসাদে যাও। আমি চললাম মণ্ডলগাঁ—বেদেনী একার কাছে, মনসার দাওয়াই আনতে। মামুদকে আমি মরতে দেবো না, তাকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো। কৈ হ্যায়, আমার টাট্টু আসমানকে নিয়ে এস। আজ—এখনি হাওয়ার মত ছুটে যাবো বেদেনী একাবতীর কাছে মনসার দাওয়াই আমার চাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মনসার মন্দির।

মঞ্জুরীর প্রবেশ।

মঞ্জুরী। দেবী জগৎ-গৌরী, তুমি আমাকে মৃত্যু দাও—এ মুখ নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

উদ্‌ভ্রান্ত নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। বৌমা—বৌমা! বড় বৌমা! তুমি এখানে রয়েছ আর আমরা তিনদিন ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, জয়ন্ত-রাণা তোমাকে খুঁজতে তিনদিন হলো রাজ্যছাড়া। কেন মা, এমন করে বুড়ো ছেলেকে কষ্ট দিলে কেন?

মঞ্জুরী। বাবা!

নরপাল। আমি তো তোমাকে কোন কষ্ট দিইনি মা! তুমি আমার রাজলক্ষ্মী, তুমি আমার প্রাসাদের জীবন্ত দেবী, তোমার কি এইভাবে এইখানে লুকিয়ে থাকা সাজে! ওরে কে আছিস—প্রাসাদে সংবাদ দে, মণ্ডলগাঁয়ের রাজলক্ষ্মী যেখানে হারিয়ে ছিল, সেখানেই তাকে খুঁজে পেয়েছি।

মঞ্জুরী। না বাবা, আমি মঞ্জুরী।

নরপাল। ছোট বৌমা!

মঞ্জুরী। হ্যাঁ বাবা! সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রাসাদ থেকে চুপি চুপি এসেছি এই মনসামণ্ডপে—যেখান থেকে হারিয়ে গেছে মণ্ডলগাঁয়ের রাজলক্ষ্মী, আমি সেখানে তাকে খুঁজতে এসেছিলাম।

নরপাল। পাবে না মা, খুঁজে আর পাবে না। লোহা হারালে যদিও পাওয়া যায়, সোনা হারালে আর পাওয়া যায় না।

মঞ্জুরী। ঠিকই বলেছেন বাবা। লোহা আমি, লোহার অপরাধে আজ সোনার শাস্তি হয়েছে। মা মনসা! এমন কি হয় না—আমি প্রাণ দিলে কি আমার দিদিকে ফিরে পাওয়া যায় না! যদি এ হয়—যদি ফিরে পাওয়া যায় রাজলক্ষ্মীকে, তাহলে এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার মাথার মৃত্যুর খড়্গ বসিয়ে দাও—আমি আর কলঙ্কিত লোহার জীবন বয়ে বেড়াতে পারি না।

নরপাল। বৌমা!

মঞ্জুরী। হ্যাঁ বাবা। আমি দেখেছি আমাকে দেখলে সবাই নাসিকা কুঞ্চিত করে, আমি শুনেছি আমাকে দেখলে সকলে কু-কথা বলে।

নরপাল। তারা মূর্খ মা।

মঞ্জুরী। না বাবা, না। মূর্খ তারা নয়, মূর্খ আমি; যার জন্য সারা মণ্ডলগাঁ আজ কাঁদছে, যার অভাবে রাজ্যে আজ অন্ধকার—সেই দেবী প্রতিমাকে আমি চিনতে পারিনি। অমৃত ভেবে যা পান করেছিলাম, আজ তা বিষ হয়ে উঠেছে, ভুল করে যা ছিঁড়তে চেয়েছিলাম, আজ দেখছি সে ভুল নয়—মুঠো মুঠো ফুল।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

নরপাল। কাঁদছো মা! কাঁদ। দেখ যদি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে টলাতে পারো জগৎ-গৌরীর আসন। দেবী জগৎগৌরী! বৌমা সাধারণ ঘরের মেয়ে, ছিল না তার রূপ—ছিল না তার উচ্চ শিক্ষা, তবু তার এমন জিনিস ছিল—যার জন্য প্রজারা কাঁদছে। না-না, কান্না কেন, সকলে মিলে দেবীকে ডাকো—ফিরে আসবে

বড় বৌমা, আবার প্রাসাদের সকলে প্রাণ খুলে হাসবে, রাজ্যের ঘরে ঘরে আনন্দের হাট বসবে। কখন আসবে মেয়েটা—আমি যে তিন দিন তার মুখখানা দেখিনি। কত কষ্ট হয়েছে তার—হয়তো তিন দিন সে খেতে পায়নি। কে আছো, যাও—প্রাসাদে যাও, পাচকদের ভাল করে রান্না করতে বল।

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদেরচাঁদ। কথাটা যেন কি রকম হলো মহারাজ।

নরপাল। কে তুমি?

নদেরচাঁদ। আজ্ঞে আমি নদেরচাঁদ কবিরাজ। যাচ্ছিলাম পাশ দিয়ে, আপনার কথা শুনতে পেয়ে ভাবলাম—যাই, একবার মহারাজকে দর্শন করে—কিন্তু একটা কথা যেন অন্য রকম শুনলাম—

নরপাল। কি কথা কবিরাজ?

নদেরচাঁদ। এই আপনার বৌমাকে নাকি কারা চুরি করে নিয়ে গেছে?

নরপাল। কবিরাজ।

নদেরচাঁদ। আজ্ঞে চোখ রাঙিয়ে সত্যিটাকে চেপে রাখতে পারবেন না। শুনছি শুকুর খাঁর লোকে চুরি করেছে। ধরুন ফিরেই যদি দেয়, তাকে নিয়ে ঘর করবেন কি করে? জাত-ধর্ম্ম বলে কথাটা তো আছে—

নরপাল। সে আমি বুঝবো।

নদেরচাঁদ। আপনি বুঝলেই তো সমাজ বুঝবে না। হাজার হোক মুসলমানে যার হাত ধরে নিয়ে গেছে, তাকে আবার—

একাবতীর প্রবেশ।

একাবতী। ঘরে দেওয়া যায় না। মহারাজ, এই বুড়া জানে কোথায় আছে বহুরাণী।

নরপাল। বেদেনী!

একাবতী। সেইদিন সাঁঝের বেলায় আমি ওকে এইখানে চুপি চুপি আসতে দেখেছে। সঙ্গে একটা আদমী ছিল, এই বুড়া তার কানে-কানে কি সব বাৎচিৎ করছিল।

নরপাল। কবিরাজ!

নদেরচাঁদ। দোহাই আজ্ঞে, আমি এসব কিছু জানি না। নিতান্ত ছা-পোষা মানুষ, কোবরেজী করে যা পাই তাই দিযে—

একাবতী। সংসার চালায় আর লোকের ক্ষতি করে।

নরপাল। কে আছো—

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। আদেশ করুন মহারাজ।

নরপাল। এই বর্ব্বরটাকে বন্দী কর। [রক্ষী নদেরচাঁদকে বন্দী করিল]

নদেরচাঁদ। দোহাই মহারাজ। কথাটা আমি রহস্য করে বলছিলাম, আপনি বৌমাকে এখনি ঘরে কেন, ঠাকুরঘরে রাখতে পারবেন। এখন ছেড়ে দিন, আমি পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে সটান বাড়ী চলে যাই।

নরপাল। ছেড়ে তোমাকে দেবো—যদি সত্যি কথা বল।

নদেরচাঁদ। একশোবার বলবো হুজুর, হাজারবার বলবো।

নরপাল। কে নিয়ে গেছে বৌমাকে?

নদেরচাঁদ। আজ্ঞে—ঠিক জানি না, তবে শুনলাম শুকুর খাঁর লোকে—একা বেদেনী মনে করে আপনার বৌমাকে নিয়ে গেছে।

নরপাল। কি বললে?

একাবতী। শুন রে রাজা, এই শয়তান আমার কাছে গিয়েছিল বিয়া করতে, আমি রাজী হলম না—অপমান করলম, তাই—

নরপাল। বিদেশী শত্রুর হাতে তোমাকে তুলে দেবার জন্য শুকুর খাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। বেইমান নদেরচাঁদ—

নদেরচাঁদ। আজ্ঞে—বেইমান আপনার ছেলে, সেই এই কর্ম্মের আসল কর্ত্তা।

নরপাল। কোথায় সে দেশদ্রোহী পশু?

নদেরচাঁদ। ভাই সাহেবের পা-চাটছে।

একাবতী। চোপরাও বুড়া।

নদেরচাঁদ। কেন চুপ করবো ছুঁড়ি। জাতে আমি কুম্ভকার। চৌদ্দপুরুষ মরেছে হাঁড়ী গড়ে, আমি হলাম কবিরাজ। বেশ চলছিল ব্যবসা, কোত্থেকে তুই ছুঁড়ি এসে আমার ব্যবসার দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দিলি। করবো না আমি এ কাজ? বেশ করেছি—করেছি, তবে সাপ মারতে গিয়ে শিব মরে গেল তা আমি আর করব কি।

নরপাল। রক্ষী! নিয়ে যাও পশুটাকে—মাথায় ঘোল ঢেলে গালে চুণ-কালি মাখিয়ে রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাবে মণ্ডলগাঁয়ের বাইরে, সঙ্গে থাকবে ঢেড়াদার, ঘোষণা করে দেবে—আজ থেকে কুম্ভকার জাতি মণ্ডলগাঁয়ে বাস করতে পাবে না।

নদেরচাঁদ। বেশ, আমি যাচ্ছি রাজা নরপাল। মণ্ডলগাঁয়ে বাস না হলেও বাংলায় আমি বাস করবো। যতদিন বেঁচে থাকবো,

ততদিন যাকে পাবো তাকে বলবো—মণ্ডলগাঁয়ের রাজা নরপালের বৌমাকে মুসলমানে চুরি করে নিয়ে গেছে, তার জাত-কুল-মানে কলঙ্কের কালি ঢেলে দিয়েছে—আর এ কাজ করিয়েছে তারই বড় ছেলে সামন্তপাল।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

নরপাল। সামন্তপাল। সামন্তপাল। আমি তার কাটা মাথা রাজপথে ঝুলিয়ে রেখে রক্তাক্ষরে লিখে রাখবো তার কুকীর্ত্তির কাহিনী। কে পারে দেশদ্রোহী সামন্তর মাথাটা কেটে আনতে।

দ্রুত হোসেন খাঁর প্রবেশ।

হোসেন। আমি পারি রাজা।

একাবতী। } কে।
নরপাল। }

হোসেন। আমি একজন বাঙালী।

নরপাল। বাঙালী।

হোসেন। হ্যাঁ মহারাজ। বাঙালী আমি, বাংলার বুকে আজ অমানুষের দাপাদাপি—এ আমি সইতে পারি না। খোদার নামে শপথ করে বলছি—অচিরে এইসব পরগাছার মূলোচ্ছেদ করবো, শুধু দশ দিন আমাকে সময় দিন।

নরপাল। দশ দিন।

হোসেন। হ্যাঁ মহারাজ, আজ আমার বড় বিপদ, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সর্পাঘাতে অর্দ্ধমৃত।

একাবতী। কি বলিলি ছোকরা? সাপে কেটেছে। কি সাপ?

হোসেন। চন্দ্রবোড়া।

একাবতী। মনসার দাওয়াই নিয়ে যা।

হোসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ একা, দাও তুমি মনসার দাওয়াই, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না।

নরপাল। সর্পাঘাত কখন হয়েছে যুবক?

হোসেন। রাত্রে।

একাবতী। রোগী পুরুষ না জেনানা?

হোসেন। বললাম তো আমার মামুদ।

একাবতী। কত বয়েস রে তোর মামুদের?

হোসেন। তা বারো থেকে তেরোর ভিতর।

নরপাল। মামুদ! একি কথা বলছো যুবক?

হোসেন। সে অনেক কথা। যদি দিন পাই, সবিস্তারে বলে যাবো, এখন এক মুহূর্ত্ত বিলম্বের অবসর নেই।

একাবতী। আচ্ছা নিয়ে যা মনসার দাওয়াই। কেটেছে রাতের বেলায়—সাপ চন্দ্রবোড়া, রোগী পুরুষ—[পুঁটলী হইতে দাওয়াই বাহির করিয়া হোসেনকে দিল] সে মনসার দাওয়াই, মা মনসার কাছে মানত করে যা—

হোসেন। দেবী মনসা! মুসলমান আমি, জীবনে কখনো মসজিদে উঠিনি, খোদাকে ডাকবার সময় পাইনি। আজ আমার বড় বিপদ, মামুদ পাঠ করেছিল তোমার কাহিনী—সেই বলে গেছে তোমার মহিমা। তাই তোমার কাছে বলে যাচ্ছি—আমার মামুদকে তুমি বাঁচিয়ে দিও। যদি সে বাঁচে, তাহলে তৈরী করে দেবো তোমার মন্দির, আজ শুধু অজ্ঞানতার অক্ষমতার উঁচু মাথা তোমার কাছে নত করে তালুকদার কাজী হোসেন খাঁ দিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার সেলাম—সেলাম—সেলাম। [দ্রুত প্রস্থান।

নরপাল। তালুকদার কাজী হোসেন খাঁ—শয়তান হাসান খাঁর ভাই। ওরে কে আছিস, ওকে বন্দী কর—বন্দী কর।

রাণার প্রবেশ।

রাণা। ওকে বন্দী করে লাভ হবে না মহারাজ।

একাবতী। } রাণা।
নরপাল। }

রাণা। হোসেন খাঁ আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

নরপাল। বৌমা—বৌমা কই রাণা?

রাণা। কোন সন্ধান পাইনি মহারাজ।

নরপাল। পাওনি। কিন্তু আমি যে শুনলাম শুকুর খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামন্ত চুরি করিয়েছে বৌমাকে?

রাণা। বৌরাণীকে নয়, বেদেনী একাকে মনে করে—

একাবতী। রাণা।

রাণা। হ্যাঁ একা, যুবরাজের সৈনিক, তুমি মনে করে বৌরাণীকে নিয়ে গেছে।

নরপাল। কোথায় আছে সামন্তপাল?

রাণা। নিখোঁজ। তাকে আর শুকুর খাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নরপাল। না-না, পাওয়া যাচ্ছে না বললে চলবে না; পেতে হবে। বিশ্বাসঘাতক নন্দেরচাঁদকে আমি রাজ্য থেকে বার করে দিয়েছি, বৌমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি—কিন্তু সামন্তপালকে আর শুকুর খাঁকে আমার চাই। ফিরে আসুক জয়ন্ত—তুমি আর সে দুজন মিলে সৈন্যসজ্জা কর। বাংলায়, কি বাংলার বাইরে—

যেখানেই তারা লুকিয়ে থাকুক, তাদের তোমরা খুঁজে বার করবে— নিয়ে আসবে আমার কাছে। আমি নিজের হাতে গর্ত্ত কেটে সেই দুই জানোয়ারকে সেই গর্ত্তে ফেলে নীচে উপরে কাঁটা দিয়ে মাটি চাপা দেবো। অন্ধকার গর্ত্তের ভিতর তারা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করবে আর আমি সেই আর্ত্তনাদ শুনে প্রাণ খুলে হাসতে থাকবো— হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

রাণা। একা! তুমি হোসেন খাঁকে মনসার ওষুধ দিলে কেন?

একাবতী। কেনে না দিবে?

রাণা। জানো না, যাকে সাপে খেয়েছে তার বাবা আমাদের শত্রু?

একাবতী। দেওতার কাছে কোন মানুষ দুষমণ নয় রে ছোকরা।

রাণা। বেগম সাহেবা মনসাকে ঘৃণা করে!

একাবতী। এইবার মাথা হেঁট করে পূজা করবে।

রাণা। একা!

একাবতী। হ্যাঁ রে ছোকরা, দুষমণকে দিতে হয় ভালবাসা, তবেই তো দুষমণ পোষ মানে।

রাণা। তাহলে আমিও আজ থেকে তোর দুষমণ।

একাবতী। আজ থেকে তোকে আমি ভালবাসা দিবে।

রাণা। একা! [একাবতীর হাত ধরিল]

একাবতী। ছোড়—ছোড়, ছোড়ে দে বেওকুব—তোকে তো আমি নিশানা দিয়েছে। [হাত ছাড়াইয়া লইল]

রাণা। কিন্তু কবে—কবে ছুটবে সেই নাগচম্পার গন্ধ? সেদিন কবে আসবে?

জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। কোনদিন না।

একাবতী।
রাণা। } কুমার।

জয়ন্ত। যার জন্য আমার বৌদি হারিয়ে গেছে, সেই মনসার কোন অস্তিত্ব আমি মণ্ডলগাঁয়ে রাখবো না।

একাবতী। কি বলছিস রাজপুত্তুর?

জয়ন্ত। তালুকদারের রাজ্যে আগুন লাগিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম, তুমি সঙ্গে এনেছিলে দেবী মনসাকে। রাজ্যের সকলে সেই মনসার পূজো করলো। পূজো খেয়ে বিষকন্যা মনসা আমাদের রাজলক্ষ্মীকে বিষের সাগরে ডুবিয়ে দিলে। এত খুঁজলাম, কোথাও তার দেখা পেলাম না। সরে যাও তোমরা, দেখি দেবী মনসা আমাকে কি বলে সান্ত্বনা দেয়—[সহসা মনসা মূর্ত্তির সামনে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া অশ্রুসজল নেত্রে করজোড়ে বলিতেছিল] দেবী জগৎগৌরী। জগতের তুমি মঙ্গল করো, তবে অমঙ্গলের ছায়া কেন ফেললে আমাদের বুকে? দেবী তুমি, অন্তর্য্যামিনী। বল কোথায় আছে আমার মাটির দেবী বৌদি? মা বলে যাকে জেনেছিলাম—দেবী বলে যাকে পূজো করেছিলাম, কোথায় আজ সেই রাজকুল-দেবী? বল—বল মা-মনসা, তোমার মন্দির গড়ে দেবো, আঙ্গিনা সাজিয়ে দেবো, ষোড়শোপচারে পূজো করবো। বলে দাও কোথায় আছে শুকুর খাঁ আর দেশদ্রোহী সামন্তপাল? তবু সাড়া দেবে না? তবু কথা বলবে না? তবে আয় পাষাণী-পাষাণময়ী—[দুই হাতে মূর্ত্তি ও ঔষধের পোঁটলা লইয়া] তোকে আমি চোখের সামনে রাখবো না।

রাণা। কুমার—

জয়ন্ত। বাধা দিও না রাণা।

একাবতী। রাজপুত্তুর—

জয়ন্ত। পথ ছাড়ো বেদিনী—কেউ আমাকে বাধা দিতে এসো না। যে পাষাণীর প্রাণে দয়া নেই—মায়া নেই, চোখের জলে পাষাণ মূর্ত্তি ধুইয়ে দিলেও যার পাষাণ অস্তিত্বে সাড়া জাগে না, সে পাথর; আর সেই পাথরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই ওষুধের—এ দুটোই আমি পদ্মদীঘির জলে ফেলে দেবো। পদ্মদীঘি আজ থেকে হবে বিষের দীঘি।

রাণা। } কুমার।
একাবতী। }

জয়ন্ত। চোখের জলে যার সাড়া মেলেনি—পূজার ফুলে তার চোখ খুলবে না।

[মূর্ত্তি ও ঔষধের পুঁটুলি লইয়া দ্রুত জয়ন্তের প্রস্থান।

রাণা। কুমার! কুমার! এমন কাজ করবেন না—শুনুন—দেবী মূর্ত্তি জলে ফেলবেন না। কে আছো, কুমারকে বাধা দাও—বাধা দাও—

[দ্রুত প্রস্থান।

একাবতী। রাণা! কুমারকে বাধা দে—তার হাত থেকে মনসা আর মনসার দাওয়াই কেড়ে নে। ও যে দৌলত, দুনিয়ার বুকে আর কোথাও ও দৌলত নেই। আমার বাপুজী খোয়াবে পেয়েছিল। রোখ—রোখ, রোখে দে। চলে গেলে দুনিয়া থেকে চলে যাবে মনসার দাওয়াই—সাপে খেলে মানুষ আর জিন্দা হবে না—জিন্দা হবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

হাসান খাঁর প্রাসাদ।

বিষে জর্জ্জরিত মামুদ ও শোভানাবানুর প্রবেশ।

শোভানা। খোদা—দীন দুনিয়ার মালেক! আমার মামুদের জান ফিরিয়ে দাও খোদা! বাপজান চলে গেছে, মামুদের এ অবস্থা—সে শুধু আমারই পাপে। ভাইজান—না-না, ভাইজান নয়—দুষমণ শুকুর খাঁ আমার সুখের খোয়াব বরবাদ করে দিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। মউৎ, তুমি নেমে এস, আর আমি বাঁচতে চাই না।

হাসান খাঁর প্রবেশ।

হাসান। ধৈর্য্য ধর শোভানা! খোদাকে ডাক, তিনি মামুদের জান ফিরিয়ে দেবে।

শোভানা। পাগল হয়েছো কাজী সাহেব! মরা মানুষ কখনও জিন্দা হয়!

হাসান। মামুদের এখনও মৃত্যু হয়নি শোভানা।

শোভানা। কাজী সাহেব!

হাসান। হ্যাঁ বেগম! সাপে কাটা মানুষ তিন দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। তাই হোসেন ছুটে গেছে, এখনি এসে পড়বে।

শোভানা। কোথায় গেছে ভাইজান?

হাসান। মণ্ডলগাঁয়ে—

শোভানা। মণ্ডলগাঁয়ে দুষমণের এক্তিয়ারে—

হাসান। বেদেনী একার কাছে—মনসার দাওয়াই আনতে।

শোভানা। মামুদের জন্য জানের মায়া ত্যাগ করে ছুটে গেছে হোসেন। কাজী সাহেব, আমি যে তাকে কত কু-কথা বলেছি— কত এনকার করেছি—

হাসান। ঠাকুরকে কুকুর বললে ঠাকুরের কিছু যায় আসে না শোভানা!

শোভানা। না-না, খোদা! আমার মৃত্যু দাও—এ মুখ আমি আর হোসেনকে দেখাতে পারবো না।

হাসান। শোভানা।

শোভানা। ওই দেখ কাজী সাহেব, মামুদ হাসছে আর বলছে, আম্মা! আর মনসার কিতাব ছিঁড়বে? ওই দেখ তালুকদার, বাপজান এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। ওই দেখ—লাল শাড়ী পরে সর্ব্বাঙ্গে সিঁদুর মেখে মাথায় সাপের জটা। ওই যে আমাকে ডাকছে। যাই—যাই বিষকন্যা মনসা—

হাসান। একি হলো! তবে কি পুত্রশোকে শোভানাও উন্মাদ হয়ে যাবে? তবে কি হোসেনে ঠিক সময়ে মণ্ডলগাঁ থেকে ফিরতে পারবে না! ওরে কে আছিস, দরওয়াজা খুলে দে—দেখ কত দূরে আসচে হোসেন—

রমজান মৌলভীর বেশে নসরৎ শাহের প্রবেশ।

নসরৎ। এসে পড়েছেন হুজুর!

হাসান। তুমি কে?

নসরৎ। আমি রমজান মৌলভী, খবরটা দিতে এলাম।

হাসান। বেশ করেছ দোস্ত। কই—কোথায়, কত দূরে আসছে হোসেন?

শোভানা। আসছে মামুদ, আসছে। আয়—আয় মামুদ, তুই আমার কোলে আয়।

হাসান। হোসেন—হোসেন।

নেপথ্যে হোসেন। ভাইজান—ভাইজান—

হাসান। ওই আসছে হোসেন। শোভানা, শোভানা—খোদা, দোয়া কর দেবী মনসা, দোয়া কর। হোসেন—

দ্রুত হোসেন খাঁর প্রবেশ।

হোসেন। ভাইজান—ভাইজান। আঃ—

হাসান। কি হলো হোসেন?

হোসেন। শেষ।

নসরৎ। কি শেষ?

হোসেন। খোয়াব, জান, ছনিয়ার আলো—সব শেষ ভাইজান। আমাকে সাপে খেয়ে গেল—

হাসান। সাপ!

হোসেন। চন্দ্রবোড়া নয়—কালনাগিনী।

নসরৎ। ওই যে কালনাগিনী পালিয়ে গেল।

শোভানা। না-না, পালিয়ে যাইনি আমি। তোমরা আমার মাথায় মুগুর মারো, আমি খেয়েছি হোসেনকে—মামুদকে, বাপজানকে—

হোসেন। মনসার দাওয়াই নাও ভাবী, মামুদকে খাইয়ে দাও।

হাসান। কিন্তু তুই?

হোসেন। আমি—আমি—আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

হাসান। না-না, মনসার দাওয়াই তুই খা।

শোভানা। সেই ভাল ভাইজান—মামুদের জানের চেয়ে তোমার জানের দাম অনেক বেশী।

হোসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিজের জানের দাম অনেক বেশী—অনেক বেশী। আমি বাঁচবো, এই সুন্দর দুনিয়ায় আমি—আঃ—না-না, ধর—ধর এই মনসার দাওয়াই, খাইয়ে দাও মামুদকে। দেরি হলে হয়তো জানের মায়ায় ইমানকে হারিয়ে ফেলবো। [হোসেন জোর করিয়া মামুদের মুখে মনসার দাওয়াই ঢালিয়া দিল]

নসরৎ। }
শোভানা। } হোসেন!
হাসান। }

হোসেন। ভয় নেই ভাইজান। তোমার তালুক তোমারই থাকলো—আমি তার ভাগ নিতে আসবো না। ভাবী! আমি তোমাদের দুষমণ—তাই দুনিয়া থেকে পালিয়ে যাচ্ছি; যাবার আগে তোমার কোলে মামুদকে জিন্দা দেখে আমি শান্তিতে মরতে পারবো। ওই শোন তোমার পিতা আমায় ডাকছেন—আমি তার কাছে চললাম।

নসরৎ। হোসেন খাঁ!

হোসেন। মৌলভী সাহেব! মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে যে মাটিতে, যে মাটির অপমান করে মসজিদে গিয়ে খোদার নমাজ পড়লে—সে নমাজ কবুল হবে না। ধর্ম্মের চেয়ে মানুষ অনেক বড়—ধর্ম্মের গোঁড়ামী ত্যাগ করুন, ডাকুন বাংলার পুরোহিতদের, মৌলভী-পুরোহিত এক সঙ্গে মিলে মহাসভার আহ্বান করুন, সকলকে বুঝিয়ে বলুন—ধর্ম্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম্ম।

মামুদ। চাচাজান! চাচাজান!

হোসেন। এই তো জেগে উঠেছে আমার মামুদ। ওরে মামুদ, আমার বুকে আয়! আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। বাপজান! যাবার আগে বলে যাই—আজ হতে তিনের পরগণার তালুকদার কাজী মামুদ হোসেন। ওরে মামুদ, তুমি হিন্দু হইও না, মুসলমান হইও না—হবে শুধু মানুষ; লাগবে শুধু দেশের সেবায়, বলবে শুধু জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী-গরীয়সী। আদাব ভাইজান, আদাব ভাবী, আদাব মৌলভী সাহেব।

[প্রস্থান।

মামুদ। না—না—না, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। চাচাজান—[প্রস্থানোদ্যত]

হাসান। শোভানা।	[মামুদকে ধরিল] হোসেন—হোসেন!

গীতকণ্ঠে কঙ্কালের প্রবেশ।

কঙ্কাল।—

গীত।

নয়নে নেমেছে ঘুম।
বাংলা মা তারে কোলে তুলে নিয়ে, ধুলা ঝেড়ে দিল চুম।
জীবনে যে আলো পারেনি দানিতে মরণে করেছে দান—
বৃক্ষের শাখা বাতাস করিবে পাখীরা শোনাবে গান,
মাধবীলতা কবরে তাহার আপনি দিবে কুসুম।

যাও মিঞা—যাও, কবরে তাকে শুইয়ে দাও।

[প্রস্থান।

শোভানা। ওরে না-না, হোসেন মরেনি, সে আমার উপর

অভিমান করে পালিয়ে গেছে। পালাতে তাকে দেবো না, তাকে আমি রাগ ভাঙিয়ে ফিরিয়ে আনবো—তার দেওয়া মনসার দাওয়াই খেয়ে আজ যে আমার মামুদ বেঁচে উঠেছে। হোসেন—হোসেন, ওরে আমার অভিমানী ভাইজান। ফিরে এস—ফিরে এস। আমি হেরে গেছি, চোখের পানীতে তোমাদের রক্তের সম্বন্ধ মুছিয়ে দিতে পারিনি।

[প্রস্থান।

হাসান। বেগম সাহেবা! [প্রস্থানোন্মত]

জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। দাঁড়াও তালুকদার!

হাসান। কে তুমি?

জয়ন্ত। আমি রাজকুমার জয়ন্তপাল।

হাসান। বল কি বলবে।

জয়ন্ত। তোমার শালা সাহেব শুকুর খাঁ কোথায়?

হাসান। তা তো জানি না।

জয়ন্ত। আমার দাদা সামন্তপাল?

হাসান। তাও বলতে পারবো না।

জয়ন্ত। মিথ্যা কথা, তুমি জানো তারা কোথায় আছে।

হাসান। না—জানি না, আমার কথা বিশ্বাস কর—

জয়ন্ত। চোপরাও মিথ্যাবাদী। তুমি সব জানো, বেদেনী মনে করে তারা আমার বৌদিকে চুরি করেছে।

হাসান। জয়ন্তপাল!

জয়ন্ত। আকাশ থেকে পড়লে যে মিঞা!

হাসান। হুঁসিয়ার হিন্দু—

নসরৎ। সাবধান হাসান খাঁ, এক পা বাড়ালে জান দিতে হবে। কোই হায়, ছোটী খাঁ—

ছোটী খাঁর প্রবেশ।

ছোটী খাঁ। যো হুকুম জনাব।

হাসান।
জয়ন্ত। } কে তুমি?

নসরৎ। আমি মুশাফির, আবদুল, মৌলভী রমজান, ভিখারী সহদেব—আর বাংলার নবাব নসরৎ শাহ। [ছদ্মবেশ উন্মোচন করিল]

হাসান।
জয়ন্ত। } আপনি।

নসরৎ। হ্যাঁ জয়ন্তপাল, তোমরা আমাকে কেউ চিনতে পারোনি, আমি কিন্তু তোমাদের সকলকে চিনেছি। ছোটী খাঁ, রাজপথে ঘোষণা করে দাও—আজ থেকে এ তালুক রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত।

হাসান। জনাব! আমি—

নসরৎ। আজ থেকে পথের ফকির।

হাসান। আমাকে—আপনি—

নসরৎ। গ্রেপ্তার করতাম, কিন্তু হোসেনের মৃত্যু হয়েছে—তুমি তার ভাইজান, তাই তার আত্মার শান্তির জন্য তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে গেলাম। ছোটী খাঁ! আজ থেকে কাজী হাসান খাঁ নজরবন্দী।

ছোটি খাঁ। যো হুকুম।

নসরৎ। এস জয়ন্ত, এখনও সেরা শয়তান শুকুর খাঁ বাকি।

জয়ন্ত। তারা কোথায় আছে জনাব?

নসরৎ। তারা কোথায় আছে সে খবর আমি পেয়েছি, পঞ্চাশ-জন গুপ্তচর তিনদিন সন্ধানের পর তাদের আড্ডা খুঁজে পেয়েছে। এক মুহূর্ত্ত বিলম্বের সময় নেই—উল্কার মত ছুটে চল আমার সঙ্গে।

হাসান। বঙ্গেশ্বর—

নসরত। হবে না মুক্তি। সেদিন সহদেব ভিখারীকে তোমরা চাবুক মেরেছিলে, এই দেখ তার দাগ—এই দাগ যতদিন না মিলায়, ততদিন তোমাকে নজরবন্দী থাকতে হবে—আর আজ থেকে থাকবে তুমি কুঁড়েঘরে—শয়ন করবে মাটিতে, আর খাবে কি জানো? এই তালুকের সবচেয়ে গরীব হিন্দুপ্রজা যা খায়, তাই—

মামুদ। জাঁহাপনার দরবারে আমার একটি আর্জ্জি আছে বঙ্গেশ্বর!

নসরৎ। বল—বল কি তোমার আর্জ্জি?

মামুদ। একের অপরাধে অপরের কি শাস্তি হওয়া উচিত?

নসরৎ। না, তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন বালক?

মামুদ। এইমাত্র আপনারই সাক্ষাতে তিনের পরগণার তালুকদার হোসেন খাঁ মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকেই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করে গেছেন। আমার চাচা তো কোন অপরাধ করেননি। অতএব—

নসরৎ। অতএব তিনের পরগণা সরকারের বাজেয়াপ্ত হবে না। আজ থেকে তুমিই হবে তিনের পরগণার আদর্শ জায়গীরদার।

[প্রস্থান।

সামন্ত। না-না, রঙটা বেশ উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

শুকুর। হবে না কেন? চারদিন যে নবাবী খানা খেয়েছে।

সামন্ত। মুখটা অমন করে ঢাকা কেন বেদেনী, লজ্জা করছে বুঝি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। নাচতে নেমে আবার ঘোমটা! চিনতে পেরেছিস ছুঁড়ি, আমি সেই সামন্তপাল—শয়তান রাণার বাড়ীতে তুই আমাকে অপমান করেছিলি।

শুকুর। বেশ করেছে অপমান করেছে।

সামন্ত। খাঁ সাহেব!

শুকুর। তুমি আমার হাতে বেদেনীকে তুলে দিয়েছ, আমি তোমার হাতে তুলে দেবো মণ্ডলগাঁয়ের মসনদ।

সামন্ত। সে কবে দেবে মিঞা?

শুকুর। সে ভাবনা আজ নয়, আজ রাত কি বাদ।

সামন্ত। ঠিক আছে, তাহলে আমি চললাম—

শুকুর। না-না, যাবে কি দোস্ত, বেদেনী কোন কথার জবাব দিচ্ছে না। আমার মনে হয় ওর কাছে সাপ-টাপ আছে। তুমি দেখ, যদি থাকে, তাহলে—

সামন্ত। সাপগুলো কেড়ে নিতে হবে, কেমন? বেশ, তাই হোক—[শিকারিণীর সম্মুখে গিয়া] কি সুন্দরী, পাথরের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? পাথর তো তুমি নও, তুমি যৌবন জোয়ারে কানায় কানায় ভরা নদী মধুমতী—[মুখের ঢাকা টানিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল] শিকারিণী—

শুকুর। শোভানাল্লা। আসমানের হুরী আজ আমার এক্তিয়ারে!

সামন্ত। শয়তান সৈনিক ভুল করে তোমাকে নিয়ে এসেছে শিকারিণী। আমি বলেছিলাম—

শিকারিণী। বেদেনীকে আনতে, কিন্তু ধর্ম্মের চাকা ঘুরে গেল, নিয়ে এলো সে আমাকে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এত নীচ তুমি, এত ছোট তুমি? সহোদর ভাইকে—দেবতুল্য পিতাকে ছেড়ে বিদেশী এক কুত্তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বজাতির মেয়েকে তার পায়ে বিকিয়ে দিতে লজ্জা হলো না তোমার? তুমি কি মানুষ?

শুকুর। না-না, মানুষ নয় বিবি, জানোয়ারের সঙ্গে দোস্তি করে জানোয়ার হয়ে গেছে তোমার খসম।

সামন্ত। ভুল হয়েছে খাঁ সাহেব! একা তার ঘরেই আছে।

শুকুর। রাখো এখন একার কথা, তার কথা কাল ভাববো—আজ যে হুরী হাতে পেয়েছি—

সামন্ত। শুকুর খাঁ। তুমি কি ভুলে গেছ শিকারিণী আমার স্ত্রী?

শুকুর। না-না, ভুলবো কোন দোস্ত! আজ চার রোজ তুমি আমি একসঙ্গে নাস্তা করেছি, একসঙ্গে গোছন করেছি, এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি, তুমি আমি এক হয়ে গেছি। কাজেই তোমার বিবি শুধু তোমার হবে কেন, সে আমারও বিবি হোক।

সামন্ত। শুকুর খাঁ। [তরবারি উত্তোলন]

শুকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কেরু দেখায় শেরকে ভয়! [তরবারি উত্তোলন] শোন হিন্দু, তুমি আমার দোস্ত, তোমার খাতিরে কাল সবেরে ছেড়ে দেবো তোমার বিবিকে।

সামন্ত। তাহলে আজকের রাত তোর শেষ রাত শয়তান।

শুকুর। আমার নয় তোর রে বে-আদব। [উভয়ের তুমুল যুদ্ধ ও শুকুরের অস্ত্র হস্তচ্যুত]

সামন্ত। কি হলো মিঞা?

শুকুর। সরাবের নেশায় তাকৎ ঢিলে হয়ে গেছে হারামীর বাচ্ছা।

থাক তুই গুপ্ত শিবিরে, আমি চললাম সেই একা বেদেনীকে নিয়ে, আজ রাতেই আফ্রিকার পথে রওনা হতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [দ্রুত প্রস্থান ।

সামন্ত। কোথায় পালাবি জানোয়ার—না-না, যাওয়া আমার হবে না। তুমি রয়েছো এখানে। শিকারিণী। চল তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রাসাদে ফিরে যাই।

শিকারিণী। প্রাসাদে নয় দেশদ্রোহী।

সামন্ত। তবে কোথায়?

শিকারিণী। [সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরি বাহির করিয়া সামন্তের বুকে বসাইয়া] শ্মশানে।

সামন্ত। আঃ—শিকারিণী।

শিকারিণী। চুপ। ও নাম মুখে এনো না অকৃতজ্ঞ। সর্ব্বাঙ্গ তোমার অশুদ্ধ, চোখে তোমার পশুর দৃষ্টি, পায়ে পায়ে নরকের কীট। তুমি আমার স্বামী নও, আমার স্বামী অনেক আগে মরে গেছে, আজ আমি তাকে খুন করলাম; সে রাজা নরপালের পুত্র নয়, তার পরিচয় সে দেশদ্রোহী।

সামন্ত। আঃ—ভগবান।

শিকারিণী। ভগবান অনেক দূরে। চোখের সামনে যে মানুষ-ভগবানের দল উপোস করে মরছে, নাগানের মধ্যে যে নর-দেবতারা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদেশী দানবের খড়্গে প্রাণ দিচ্ছে—তাদের তুমি ঘৃণা করেছ, আজ তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। দুর্ব্বল আজ বাঙালী, উদ্যমহীন আজ বাংলার জওয়ানেরা। তাদের দাঁড়াবার জন্য হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির সিঁদুর মুছে—প্রচণ্ডা চামুণ্ডার মত ছুটে চললো মগধের মেয়ে বাংলার বধূ বিধবা শিকারিণী। [দ্রুত প্রস্থান ।

সামন্ত। আমি চিনতে পারিনি শিকারিণী। যখন চিনলাম দেশকে, দেশের মানুষকে, সহধর্ম্মিনী তোমাকে—তখন এপারের খেয়া ওপারে পৌঁছে গেছে। শিকারিণী—

দ্রুত রাণার প্রবেশ।

রাণা। বৌরাণী! বৌরাণী—

সামন্ত। চলে গেছে রাণা।

রাণা। একি যুবরাজ! আপনাকে—

সামন্ত। ওপারের ঠিকানা বলে দিয়ে চলে গেছে বাংলার দেবী।

রাণা। যুবরাজ!

সামন্ত। শিকারিণীকে নিয়ে এসেছিল বেদেনী মনে করে আমারই এক সৈনিক। আঃ, দাঁড়াতে পারছি না। রাণা—রাণা, শুকুর খাঁ ছুটে গেছে একার সন্ধানে, হয়তো সে আজই রাত্রে তাকে নিয়ে আফ্রিকার পথে পাড়ি দেবে।

রাণা। না-না, পাড়ি দিতে দেবো না।

সামন্ত। না—দিও না রাণা, শুকুর খাঁকে পালাতে দিও না, দেশের স্বাধীনতা সূর্য্য ডুবতে দিও না। আর আমি যে স্ত্রীর হাতে প্রাণ দিয়েছি—এ কলঙ্কিত সংবাদ বাংলার ইতিহাসে কিছুতেই লিখতে দিও না—দিও না—দিও না।

[প্রস্থান।

রাণা। যুবরাজ! যুবরাজ!

নসরৎ শাহের প্রবেশ।

নসরৎ। কই, কোথায় যুবরাজ সামন্তপাল?

রাণা। পালিয়ে গেছে বঙ্গেশ্বর।

দ্রুত জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। না-না, কাউকে পালাতে দিও না রাণা, কেউ যেন পালাতে না পারে।

রাণা। সকলে পালিয়ে গেছে কুমার।

জয়ন্ত। বৌদি—বৌদি কোথায়?

রাণা। স্বামীকে হত্যা করে রক্তমাখা ছুরি হাতে নিয়ে উল্কার মত ছুটে গেছে মণ্ডলগাঁয়ের পথে।

জয়ন্ত। দাদা—দাদা!

রাণা। এপারের খেলা শেষ করে ওপারে চলে গেছেন।

নসরৎ। কিন্তু শুকুর খাঁ কোথায় গেল যুবক?

রাণা। সে ছুটে গেছে বেদেনীর সন্ধানে, আজ রাত্রেই বোধহয় বেদেনীকে নিয়ে সে আফ্রিকার পথে রওনা হবে।

নসরৎ। না-না, পালাতে সে পারবে না। জয়ন্ত, আমার বাছাই বাছাই সৈন্য দিয়ে তুমি মণ্ডলগাঁ ঘিরে ফেল। রাণা, তুমি বিশজন বলিষ্ঠ জওয়ানকে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে বেদেনীর কাছে হাজির হও।

জয়ন্ত। আপনি কি করবেন বঙ্গেশ্বর?

নসরৎ। আমি—আমি নিজের হাতে কামান দেগে বাংলার বুক থেকে হাবসীদের শেষ আস্তানা আশমানে উড়িয়ে দেবো। আমার পিতা হাবসীর রক্তে পা ধুয়ে বাংলার মসনদে বসেছিলেন, কিন্তু জানোয়ারের জাত হাবসীদের বাংলার মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে পারেন নি। তাই আজ হতে জারি হবে আমার নতুন আইন

প্রবর্তনের ফারমান, সে ফারমানে লেখা থাকবে—কোন মুসলমান জায়গীর পাবে না, কোন হিন্দু মুসলমানদের এনকার করতে পারবে না ; বাংলা ভাষায় অনুবাদ হবে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেশে বাস করে যে বে-আদব মাটিকে করবে বে-ইজ্জত—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, তার পা রাখবার ঠাঁই এই বাংলার মাটিতে হবে না। এস জয়ন্ত।

[জয়ন্ত সহ প্রস্থান।

রাণা। একি, কে কাঁদছে। আকাশ বাতাস বাংলার মাটি! কেন? না-না, দাঁড়াবার সময় নেই। একার সন্ধানে ছুটে গেছে হাবসী শুকুর খাঁ—তাকে আমি মাঝপথেই শেষ করবো। ভয় নেই—ভয় নেই, উল্কার মত ছুটে যাচ্ছে জেলের ছেলে রাণা। একা—একা—একা—

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

মাথায় ঝাঁপি ও হাতে ডম্বরু লইয়া গীতকণ্ঠে
একাবতীর প্রবেশ।

একাবতী।— গীত।

একা কন্যা জাগে সারারাতি,
হলদি কাপড় মোমের বাতি জ্বলছে সারা রাতি রে—
একা কন্যা জাগে সারারাতি।

মণ্ডলগাঁ, আমি চললাম। কেনে আমি থাকবে বল। রাজপুত্তুর আমার মনসা দাওয়াই দীঘির জলে ফেলে দিয়েছে, বৌরাণী চোরী হয়ে গেছে, লোকে বলছে এসব বেদেনীর লেগে হচ্ছে। তারা ঠিক বলছে। আমার দিলে রং লেগেছে, বুকে কদিন হলো নাগচম্পার খসবু ছুটছে, নাগিনী চিতি ডোমনার লেগে ফোঁস ফোঁস করছে। এসব আপার পাপ—না-না, আমি এখানে থাকবে না, আজ রাণা ঘরে নাই, সবেরে ডোমনা এসে দেখবে—

শুকুর খাঁর প্রবেশ।

শুকুর। পাহাড়ী চিতি পালিয়ে গেছে।

একাবতী। কে তুই?

শুকুর। ওস্তাদ বেদে।

একাবতী। বেদে!

শুকুর। হ্যাঁ, পাহাড়ী চিতি ধরতে এসেছি।

একাবতী। তুই শালা সাহেব!

শুকুর। চিনতে তাহলে ভুল হয়নি বেদেনী।

একাবতী। কেনে ভুল হবে রে ছোকরা, আজ দু'রোজ আমি তোর কথা ভাবনা করছে।

শুকুর। কেন একা?

একাবতী। এ মুলুকে এলম, কেউ বললে না শাদী করব, এত বয়েস হলো, শাদী না করলে চলে জওয়ান! তাই ভাবছিলম চলে যাই শালা সাহেবের কাছে।

শুকুর। যাবে একা! সত্যি বলছো?

একাবতী। কেনে, বেদেনী কি কখনও মিছা কথা বলেছে?

শুকুর। তাহলে চল একা, তুমি আমি আফ্রিকা চলে যাই।

একাবতী। সে মুলুক কত দূরে ছোকরা?

শুকুর। অনেক দূর। তার জন্য ভাবনা নেই। আমরা নদী-পথে যাত্রা করব।

একাবতী। হ্যাঁ রে জওয়ান, আমি এখানে এসেছি—তুই জানলে কি করে?

শুকুর। সে অনেক কথা, পরে বজরায় বসে মউজ করে বলবো।

একাবতী। বজরা কি রে?

শুকুর। নৌকো।

একাবতী। বহুৎ আচ্ছা! দরিয়া যখন নাচবে, তখন আমাদের বজরাও তো নাচবে রে ছোকরা?

শুকুর। আলবৎ নাচবে। দরিয়ার তালে তালে নাচবে বজরা, বজরার নাচের ছন্দে ছন্দে নেচে উঠবে তোমার সবুজ দীল—

একাবতী। আমার দীলের নাচন দেখে নাচ করবে তোর খোয়াব—

শুকুর। আমার খোয়াবের মউজ আমাকে করবে মাতোয়ালা, আসমানে উঠবে রমজানের চাঁদ, দরিয়ায় ঢেলে দেবে মুঠো মুঠো সোনার গুঁড়ো। তুমি বলবে—[একার হাত ধরিল]

একাবতী। বাদশা, আর তুই বলবে—

শুকুর। বেগম। বাদশা আবেশে জড়িয়ে ধরবে বসরাই গোলাপকি মাফিক বেগম সাহেবার হাত, তারপর সোহাগ ভরে তার মুখে দিবে—[তড়িৎগতিতে একাবতী কটি হইতে কালনাগিনী বাহির করিয়া শুকুরের সামনে ধরিলে নাগিনী শুকুরের বক্ষে দংশন করিল, একা বলিল]

একাবতী। চুমা।

শুকুর। আঃ, কালনাগিনী—

একাবতী। চুমা দিয়েছে তোর বুকে শয়তান। যা, এবার কবরে যা।

শুকুর। বেদেনী—

একাবতী। হুঁসিয়ার জানোয়ার, এদিকে আসলে ডোমনাকে ছেড়ে দোব, আবার তোকে খেয়ে লিবে—হাঁ।

শুকুর। না-না, ছেড়ে তোকে দেবো না শয়তানী নাগিনী। মৃত্যু আমার হবে, তবু তার আগে আমি তোকে—[পড়িয়া গেল]

একাবতী। [খিল খিল হাসিয়া] দেখে লিবে, কেমন ? লে, দেখে লে জানোয়ার—[পতিত শুকুরের দেহে পদাঘাত করিল]

শুকুর। আঃ—খোদা! আমার কোন খোয়াব তুমি মিটতে দিলে না, একে একে সব মিথ্যার দরিয়ায় ভেসে গেল।

নেপথ্যে রাণা। একা!

একাবতী। রাণা আসছে।

শুকুর। না-না, তার আগে আমি তোর কাছ থেকে পালিয়ে যাবো শয়তানী।

একাবতী। কেনে, থাক না, ডোমনা এসে দিবে একটা কামড়—

শুকুর। উঃ, সব আজ মুখ বুজে সইতে হচ্ছে। না-না, সইবো না আমি, কাফের রাণাকে এ দৃশ্য দেখতে দেবো না। আমি পালিয়ে যাই—পালিয়ে যাই। খোদা, কোনদিন তোমাকে ডাকিনি, আজ প্রথম ও শেষ ডাক ডাকছি—তুমি আমায় মৃত্যু দাও মেহেরবান— [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

একাবতী। [খিল খিল হাসিয়া] যা শয়তান, জিন্দা হতে পারবে না, তুনিয়ার কেউ আর তোকে জিন্দা করতে পারবে না। নসার দাওয়াই দীঘির পানিতে হারিয়ে গেছে—

নেপথ্যে রাণা। একা!

একাবতী। রাণা এসে পড়েছে, ডোমনার জাত ছোকরা, চিতির বুকে নাগচম্পার খসবু ছুটছে, বুঝলে? না-না, সে আমাকে ছেড়ে দিবে না, আমি তাকে এই মিঠা রাতের নিশানা দিয়েছিল। সে আসছে—আসুক রাণা, আসুক ছোকরা ডোমনা, এসে দেখবে চিতির জাত একার বুকে কালনাগিনীর চুমো—

দ্রুত রাণার প্রবেশ।

রাণা। একা! একা! কতদূর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তোমার ঘরে গিয়ে দেখলাম তুমি নেই। অস্পষ্ট চিৎকার শুনে বুঝলাম তুমি এদিক দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছো। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে ওই ঝোপের ধারে দেখি শুকুর খাঁ মরে পড়ে আছে, তারপর পেলাম—

একাবতী। কি পেলি রে রাণা?

রাণা। সেই মিঠা রাতের নিশানা, নাগচম্পার গন্ধ।

একাবতী। বহুৎ আফশোষ ছোকরা। চিতির নাগচম্পার খসবু তুই পেলি, লেকিন চিতিকে তুই পাবি না। [সম্মুখে নাগিনী ধরিল]

রাণা। একা!

একাবতী। ফিরে যা ছোকরা, লিয়ে যা বেদেনী একার ভালবাসা! তোকে আমার পরাণের ভালবাসা দিয়ে আমি যাবে চলে দুনিয়ার বাইরে।

রাণা। না-না, মরতে তোমাকে দেবো না প্রিয়া—[সহসা একাবতীর হস্তস্থিত কালনাগিনী কাড়িয়া লইতে গেলে তাহা দংশন করিল, রাণা আর্তনাদ করিয়া উঠিল আঃ—

একাবতী। রাণা! একি করলি বেওকুব—একি করলি?

রাণা। ঠিকই করেছি একা। আজ যে মিঠা রাতের নিশানা পেয়েছি, আজ যে তোমার বুকে পেয়েছি নাগচম্পার খসবু। [একাবতীকে ধরিল]

একাবতী। না-না, তুকে আমি মরতে দিবে না, মনসার দাওয়াই দিয়ে—[আর্তনাদ করিয়া] রাণা! তোকে জিন্দা করার কোন উপায় নাই, মনসার দাওয়াই হারিয়ে গেছে।

রাণা। বেশ হয়েছে একা, ভালই হয়েছে।

একাবতী। না রে পিতম, ভাল হয়নি, এই এতক্ষণ ভাল হবে—[নাগিনীর ছোবল নিজ বক্ষে লইল] আঃ, রাণা—আমার পিতম—

রাণা। একা—একি করলে প্রিয়া?

একাবতী। ভাল করলম রে পিতম! তুই একা যাবি কেনে, তোর সাথে তোর প্রিয়াও যাবে। আয় পিতম—[রাণার হাত ধরিয়া] তুই আমি পাশাপাশি ঘুম যাবো। ডোমনার পাশে থাকবে চিতি, পিতমের পাশে থাকবে প্রিয়া, রাণার পাশে থাকবে রাণী। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত ঈশানের প্রবেশ। তাহার স্কন্ধে জাল, হাতে মনসার মূর্ত্তি

ঈশান। রাণা—রাণা, ওরে দাদু! দীঘির জলে খেয়া দিয়ে পেয়েছি মা-মনসা। তুই শীগগির একাকে খবর দে। রাণা—

নরপালের প্রবেশ।

নরপাল। রাণা নেই ঈশান।

ঈশান। কেনে মহারাজ, কোথায় গেছে? আপনি তাকে কোথায় পাঠিয়েছে বুঝি? কিন্তু একা—তাকেও তো ঘরে দেখলাম নি।

জয়ন্তপালের প্রবেশ।

জয়ন্ত। একাও গেছে রাণার সঙ্গে।

ঈশান। কোথায় গেল তারা? ফিরবে কবে বলে গেছে?

নসরৎশাহের প্রবেশ।

নসরৎ। তারা আর ফিরবে না বৃদ্ধ—তারা বেহেস্তে গেছে।

ঈশান। তুমি আবার কে? কোথা গেছে বললেন? আমি যে বেদেনীর লেগে বুকে করে নিয়ে এসেছেন মনসা ঠাকুর! কবে আসবে তারা, কোথায় রাখবো এই মনসা ঠাকরুণকে?

রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে শিকারিণীর প্রবেশ।

শিকারিণী। আমাকে দাও ওই দেবী মনসা। [ঈশানের হাত হইতে মূর্ত্তি লইল]

জয়ন্ত ও নরপাল। তুমি!

শিকারিণী। দেশদ্রোহী অকৃতজ্ঞ নাস্তিক স্বামীর বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলাম এই দেবী জগৎগৌরী।

নরপাল। সামন্ত—

শিকারিণী। নেই বাবা। তাকে আমি খুন করেছি। এইবার তার জীবনসঙ্গিনী চললো মরণসঙ্গিনী হতে। [নিজ বক্ষে ছুরি বসাইল]

জয়ন্ত। বৌদি। [ধরিল]

নরপাল। [আর্ত্তনাদে] বৌমা।

ঈশান। কি হলো মশাই?

নসরৎ। সব শেষ হয়ে গেল বৃদ্ধ। ঘরে ফিরে যাও, তোমার নাতী রাণা আর বেদেনী একাবতীর মৃত্যু হয়েছে।

ঈশান। এঁ্যা! কি বললে আপনি? না-না, তা হতেই পারে না। রাণা—ওরে রাণা—আমার নয়নমণি, আমাকেও তোদের সঙ্গে নিয়ে যা।

[প্রস্থান।

নসরৎ। যাও জয়ন্ত, দেবীকে নিয়ে যাও। রাজা নরপাল, মানবী শিকারিণী প্রতিষ্ঠি করে গেলেন দেবী জগৎগৌরী, মন্দির তৈরী করে প্রস্তর ফলকে তা লিখে দেবেন।

[শিকারিণী সহ জয়ন্তের প্রস্থান।

নরপাল। তাই দেবো বঙ্গেশ্বর, আর নির্দেশ দিয়ে যাবো যে ঈশান কৈবর্ত্ত হারানো সম্পদ উদ্ধার করেছে, তার বংশধর আর তার জাতিই বহন করবে দেবী জগৎগৌরীর চতুর্দ্দোল—

নসরৎ। আর দেবীর পদপ্রান্তে পদ্মস্বরূপ ঘুমিয়ে রইল দুই বেহেস্তের প্রেমিক-প্রেমিকা। একজন মণ্ডলগাঁয়ের ছেলে রাণা আর একজন বেদেনী একাবতী "যাযাবরী"।

—যবনিকা—